গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৯ বর্ষ ৪৫ সংখ্যা ২৯ জুন - ৫ জুলাই ২০০৭ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

স্কুলস্তরে যৌনশিক্ষা কি সমর্থনযোগ্য

রাজ্যে স্কুলস্তরে যৌনশিক্ষা চালু করার সরকারি সিদ্ধান্তে শিক্ষক-ছাত্র-অভিভাবক সকলেই উদ্বিগ্ন। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে, কেন এই যৌনশিক্ষা? কী এর উদ্দেশ্য?

১৯৯৩ সালে ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং (এন সি ই আর টি) -এর পক্ষ থেকে মারণ রোগ এইডস্, তথা এইচ আই ভি-র ক্রমাগত বেড়ে চলা বিপদ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছিল। সেমিনার থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, এই ভয়াবহ রোগটি সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের সতর্ক করার উদ্দেশ্যে স্কুলস্তরে যৌনশিক্ষা চালু করা হবে। 'বয়ঃসন্ধির শিক্ষা' নাম দিয়ে এন সি ই আর টি'র তরফ থেকে এ সংক্রান্ত একগুচ্ছ বইও প্রকাশ করা হয়েছিল। একটি বইয়ে বলা হয়েছিল, "...বয়ঃসন্ধিতে উপনীত কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে ক্রমাগত বেড়ে চলা যৌন আচরণ সংক্রান্ত সমস্যা এবং এইডসের বিস্তার, এর প্রয়োজনীয়তা দাবি করে"। ১৯৯৯ সাল থেকে এন সি ই আর টি, 'এইডস প্রিভেনশন অ্যান্ড কন্ট্রোল সোসাইটি'র সঙ্গে যুগ্মভাবে বিভিন্ন রাজ্যে বহু সেমিনারের আয়োজন করে। বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষাদপ্তর, এইডস নিয়ন্ত্রণ নিয়ে কাজ করা বহু এন জি ও-র সঙ্গে মিলে স্কুলশিক্ষকদের জন্য নানারকম 'ওরিয়েন্টেশন কোর্স'-এর ব্যবস্থা করে। কেন্দ্রে বিজেপি সরকার ক্ষমতাসীন থাকাকালে এন সি ই আর টি, 'ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক ফর স্কুল এডুকেশন ২০০০' নামে একটি সংস্থা তৈরি করে। এই সংস্থা, বিশ্বায়নের যুগের নানা সমস্যা, যেমন অপরিণত বয়সে গর্ভবতী হয়ে পড়া, যৌনতা ও ড্রাগ নেওয়াকে কেন্দ্র করে ঘটে চলা নানা ধরনের অপরাধের কথা মাথায় রেখে স্কুলস্তরে যৌনশিক্ষা চালু করার জন্য জোরদার সওয়াল করে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদগুলির কাউন্সিল বয়ঃসন্ধিকালীন শিক্ষার একটি পাঠ্যসূচি তৈরি করে। এই নতুন পাঠ্যসূচিতে মানুষের জননতন্ত্র বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়, যার মধ্যে কৈশোর থেকে যৌবনে পৌঁছবার কালে বেড়ে ওঠা শরীরের বিশেষ প্রয়োজন, যৌনতা, কিশোরী মেয়েদের যৌন নিপীড়নের শিকার হয়ে পড়ার সম্ভাবনা, নানা ধরনের যৌন নিপীড়ন এবং তা প্রতিরোধ করার উপায় — ইত্যাদি আলোচ্য বিষয়সূচি হিসাবে রাখা হয়। ১৭টি রাজ্যের শিক্ষাপর্ষদ এই পাঠ্যসূচি অনুমোদন করে এবং এদের মধ্যে সবার আগে পশ্চিমবঙ্গই, এই শিক্ষাবর্ষ থেকে 'জীবনশৈলী' শিক্ষার নামে যৌনশিক্ষা চালু করে।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউ এইচ ও) তাদের ১৯৯১ সালের রিপোর্টে উল্লেখ করেছিল যে, ১৯৮১ থেকে ১৯৯০-এর মধ্যে এইডস্ রোগাক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪ কোটিতে। এদের ৯০ শতাংশের বাস তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে এবং মোট রোগীর এক-চতুর্থাংশ হল শিশু। এই রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে বিশ্বব্যাঙ্কের আর্থিক সাহায্যে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে এইডস্ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কর্মসূচি গৃহীত হয়, আমাদের দেশেও তা চালু হয়। ১৯৯৪ সালে ১৭৯টি দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে জনসংখ্যা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত যে কনফারেন্স হয়েছিল তাতে সিদ্ধান্ত হয়েছিল, প্রতিটি দেশই যৌনস্বাস্থ্য শিক্ষা, তথ্য ও যত্ন সংক্রান্ত তাদের কিশোর-কিশোরীদের অধিকার সুরক্ষিত করবে। কনফারেন্সে আরও বলা হয়েছে, "বয়ঃসন্ধিকালীন কিশোর-কিশোরীদের বিশেষ প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে সরকারগুলিকে।"

এই সমস্ত আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি থেকে অপরিমিত উৎসাহ এবং শাসকশ্রেণীর সমর্থন পেয়ে আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি স্কুলস্তরে যৌনশিক্ষা চালু করার ব্যাপক চেষ্টা চালায়। কিন্তু জনসাধারণের পক্ষ থেকে বিপুল বাধা আসে। স্কুলস্তরে যৌনশিক্ষা দেওয়া হলে শিক্ষার্থীদের তরুণ মনের ওপর তার বিরূপ প্রভাব সম্পর্কে অভিভাবককুল সহ সমাজের প্রখ্যাত মানুষজন তাঁদের দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেন। শিক্ষকসমাজের পক্ষ থেকে প্রভূত সোরগোল ওঠে। যৌনশিক্ষার বইগুলিকে পর্নোগ্রাফির নামান্তর আখ্যা দিয়ে তীব্র ঘৃণার সাথে ছাত্রছাত্রীদের তা পড়াতে তাঁরা অস্বীকার করেন। গণবিক্ষোভের মুখে পড়ে কেরালা, মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র এবং গুজরাটের মতো রাজ্যগুলিতে স্কুলস্তরে

তিনের পাতায় দেখুন

নন্দীগ্রামের মানুষকে পদানত করার মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে সিপিএম

নন্দীগ্রামের মানুষ অসীম সাহস ও অনমনীয় দৃঢ়তায় আন্দোলনে অবিচল থাকায় সরকার বাধ্য হয়েছে নন্দীগ্রামে জমি নেওয়া হবে না এবং বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চ ল করা হবে না বলে ঘোষণা করতে। তবুও কেন আজও নন্দীগ্রামে আন্দোলন চলছে — এ প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। জমি অধিগ্রহণ বা বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চ ল নিয়ে এখন নন্দীগ্রামের মানুষ আন্দোলন করছে না। আজ তাদের সিপিএম জল্লাদবাহিনীর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার মরিয়া লড়াই চালাতে হচ্ছে। ১৪ মার্চের গণহত্যা ও গণধর্ষণের সঙ্গে যুক্ত অপরাধীদের আজও গ্রেপ্তার করা হয়নি। বরং খেজুরি ও নন্দীগ্রামের মাঝে যে তালপাটি খাল আছে, সেই খালের ওপারে খেজুরির দিকে পুলিশ ক্যাম্প বসিয়ে তার আড়ালে থেকে সিপিএম জল্লাদবাহিনী নিয়মিত বোমা-গুলি চালিয়ে যাচ্ছে। হাজার হাজার মানুষের ঘরছাড়ার মিথ্যা প্রচার চালিয়ে জনমত বিভ্রান্ত করে ঘরছাড়াদের ঘরে ঢোকানোর নাম করে সিপিএম নেতারা পুলিশের সাহায্যে খুনি ও ধর্ষণকারীদের — যাদের গ্রেপ্তার করার কথা, তাদের এলাকায় ঢুকিয়ে জনগণের উপর নির্বিচারে অত্যাচার চালানোর ও তাদের রাজনৈতিক আধিপত্য কায়েম করার মরিয়া চেষ্টা করছে।

আইনের রক্ষক পুলিশ এখানে তাদের মদতদাতার ভূমিকাই নিচ্ছে। পুলিশের সামনেই সিপিএম জল্লাদবাহিনী গুলি-বোমা ছুঁড়ছে। তাদের পুলিশ গ্রেপ্তার করছে না, তাদের অস্ত্র আটক করছে না, এমনকী তাদের বিরুদ্ধে কোনও মামলা দায়েরও করছে না। অথচ সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে আন্দোলনকারী ১৯৬০ জনের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং এই সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে।

সম্প্রতি জানা গেছে, সিপিএম নেতারা বড় রকমের একটা আক্রমণের ছক কষছে। তাঁরা দক্ষিণ ২৪ পরগণা থেকে কুখ্যাত সমাজবিরোধী সেলিমের নেতৃত্বে ১৫০-এর বেশি সমাজবিরোধীকে খেজুরিতে জড় করেছে। তাছাড়া কেশপুর,

দুইয়ের পাতায় দেখুন

বিদ্যুতের মাশুল কমানো এবং লোডশেডিং বন্ধের দাবিতে লাগাতার বিক্ষোভের ডাক

২০০৭-০৮ সালের জন্য বিদ্যুৎ মাশুল গড়ে ইউনিট প্রতি ২ টাকা, কৃষিতে ৫০ পয়সা এবং ক্ষুদ্রশিল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসা ও গৃহস্থদের ১ টাকা করার দাবি এবং অবিলম্বে অস্বাভাবিক লোডশেডিং, লো-ভোল্টেজ বন্ধ করার দাবিতে বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন দপ্তরে ২৫ জুন '০৭ থেকে ২৯ জুন পর্যন্ত লাগাতার বিক্ষোভ জানাবার জন্য রাজ্যের বিদ্যুৎ গ্রাহকদের আহ্বান জানিয়েছে অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন (অ্যাবেকা)। এই উপলক্ষে ২২ জুন কলকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে পরিস্থিতির বিস্তৃত ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন, সংগঠনের সভাপতি সঞ্জিত বিশ্বাস ও সাধারণ সম্পাদক অমল মাইতি।

তাঁরা বলেন, বর্তমানে সিইএসসি এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানিসহ পশ্চিমবঙ্গের সব কয়টি বিদ্যুৎ কোম্পানিই লাভজনক সংস্থা। রিজ্‌নেবল রিটার্ন বাদ দিয়েই ২০০৬-০৭ সালে সিইএসসির লাভ হয়েছে ২৯৭ কোটি টাকা এবং পর্ষদের লাভ হয়েছে ৩০০ কোটি টাকা। অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা, এত বিশাল মুনাফার পরেও ২০০৭-০৮ সালের জন্য সিইএসসি ১২ শতাংশ এবং এসইডিসিএল (পর্ষদ) ৫ শতাংশ মাশুল বৃদ্ধির প্রস্তাব করেছে পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের কাছে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের মনোনীত একটি সংস্থা হওয়ার ফলে প্রতি বছরই রাজ্য সরকারের নির্দেশে বিদ্যুৎ কোম্পানিগুলির মাশুলবৃদ্ধির প্রস্তাবকে অনুমোদন দেওয়াই এর কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা আশঙ্কা করছি যে, জুন মাসের শেষের দিকে অথবা জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে ২০০৭-০৮ সালের জন্য কমিশন এই কোম্পানিগুলির প্রস্তাবকে অনুমোদন দিয়ে বর্ধিত নতুন বিদ্যুৎ মাশুল ঘোষণা করবে।

এই মাশুল বৃদ্ধির সপক্ষে সিইএসসি এবং এসইডিসিএল কয়েকটি হাস্যকর যুক্তির অবতারণা করেছে। সিইএসসি জানিয়েছে যে, তারা লোডশেডিং ও বিদ্যুৎ চুরি কমিয়ে ভাল কাজ

আটের পাতায় দেখুন

সাপ্তাহিক 'গণদাবী' পড়ুন ও গ্রাহক হোন

পুরুষোত্তমপুরে ন্যায্য আন্দোলনে বর্বর আক্রমণ

জমির ন্যায্য মূল্য ও জমিহারা পরিবারের একজনকে চাকরি দেওয়ার দাবিতে আসানসোলের পুরুষোত্তমপুরে যাঁরা আন্দোলন করছিলেন, সিপিএম সরকারের পুলিশ ও দলীয় হার্মাদবাহিনী গত ১৭ জুন তাঁদের উপর বর্বর আক্রমণ নামিয়ে এনেছে। ৮০ বছরের বৃদ্ধাসহ মা-বোনেদের উপর পুলিশ ও দলীয়বাহিনী লাঠি-ইট-পাথর চালিয়েছে নির্বিচারে। টেনে হিঁচড়ে ভ্যানে তোলা হয়েছে। আহত অবস্থাতেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শতাধিক জেলবন্দী মানুষকে তাদের প্রয়োজন মতো পানীয় জল পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। বেশ কয়েকজন ধৃত আন্দোলনকারীকে আদালতে এনে ঘন্টার পর ঘন্টা বসিয়ে রাখা হয়। এমনকী প্রাকৃতিক ক্রিয়াকর্ম থেকেও তাঁদের বিরত থাকতে বাধ্য করা হয়।

ইস্কোর বার্নপুর সংলগ্ন পুরুষোত্তমপুরের এই মানুষরা একথা বলেননি যে, তাঁরা জমি দেবেন না। ইস্কোর পুনরুজ্জীবনের জন্য কারখানা বাড়াবার উদ্দেশ্যে যেসব জমি চিহ্নিত করে সরকার অধিগ্রহণ করতে চেয়েছে, এই জমির মালিকরা তা দিয়ে দিতে অস্বীকার করেননি। তাঁদের দাবি দু'টি। প্রথম দাবি, জমির মূল্য বর্তমান বাজার দর অনুযায়ী নির্ধারণ করতে হবে। এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ করা দরকার যে, ইস্কো কারখানা সম্প্রসারণ করা হবে বলে ১৯৮৯ সালে ইস্কো কর্তৃপক্ষ ৩০৫ একর জমি অধিগ্রহণের পরিকল্পনা নেয়। হিরাপুর মৌজায় ৪৫ একর, নাকরাসোতায় ১৬ একর এবং পুরুষোত্তমপুর মৌজায় ২৪৪ একর। এই সমস্ত জমির চরিত্র ও দাম জানিয়ে কর্তৃপক্ষ ২০০৬ সালের আগস্ট মাসে জমির মালিকদের নোটিশ পাঠায়। কর্তৃপক্ষের দাবি, অক্টোবর মাসে শুনানির সময়ে কেউ জমি দিতে আপত্তি করেননি। অথচ, ঘটনা হল, যাদের জমি অধিগৃহীত হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছিল, তার মধ্যে ১০৪ একরের মতো জমির মালিক ২৯৪টি পরিবার জমির দাম বাবদ চেক নেয়নি, বাকিরা চেক নিয়ে নেয়। যে ২৯৪টি পরিবার চেক সে'সময় নেয়নি, তারা ল্যান্ড লুজার কমিটির নেতৃত্বে বেশি দামের দাবি তোলে। হিরাপুর, নাকরাসোতা গ্রামের এই জমির মালিকরা একর প্রতি ১২ লক্ষ থেকে ১৬ লক্ষ টাকা করে পেয়েছেন, অথচ পুরুষোত্তমপুর এলাকার জমির মালিকরা দাম পেয়েছেন একর প্রতি ৫ লক্ষ টাকা করে। জমির চরিত্র এক হওয়া সত্ত্বেও দামের এই বৈষম্য নিয়েই আপত্তি উঠেছে পুরুষোত্তমপুরে। দ্বিতীয়ত, তাঁদের বক্তব্য, অতীতে ইস্কো কর্তৃপক্ষ যাঁদের জমি অধিগ্রহণ করেছিল, তাঁদের পরিবারপিছু একজনকে চাকরিও দিয়েছে। এমনকী

অধিগৃহীত জমির পরিমাণ বেশি হলে পরিবারের একাধিক সদস্যকেও চাকরি দিয়েছে। এখন তা দেওয়া হবে না কেন ? তাই আন্দোলনকারীদের দাবি — সমহারে বা বাজার দর অনুযায়ী জমির দাম দিতে হবে, দামের পার্থক্য করে জনগণের ঐক্যে ভাঙন সৃষ্টি করা চলবে না। তাছাড়া যাঁদের জমি নেওয়া হচ্ছে, তাঁদের পরিবারপিছু একজনকে চাকরি দিতে হবে। এই দাবিগুলিই প্রমাণ করে যে, পুরুষোত্তমপুরের জনগণ ইস্কোর সম্প্রসারণের বিরোধিতা করছেন না, তাঁরা নিজেদের জীবন-জীবিকার সুরক্ষা চাইছেন। আরও বিস্ময়কর তথ্য হচ্ছে, সিদ্ধান্ত মতো ইস্কো কর্তৃপক্ষ জমির মূল্য বাবদ ৪০ কোটি টাকা রাজ্য সরকারকে দিয়েছে। অথচ সরকার জমির দাম বাবদ মাত্র ১৬ কোটি টাকা দিয়েছে, বাকি টাকার কী হল?

এই ন্যায্য আন্দোলন ভাঙবার উদ্দেশ্যে এই আন্দোলন সম্পর্কে ইস্কোর শ্রমিক-কর্মচারীদের বিরূপ করে তোলার জন্য সিপিএম ও সিটু নেতৃত্ব প্রচার করছেন যে, তাঁদের 'ইস্কো বাঁচাও কমিটি'র সংগ্রামের ফলেই ইস্কোর পুনরুজ্জীবন যখন সম্ভব হয়েছে, বিরোধী দলের প্ররোচনায় পুরুষোত্তমপুরের মানুষ তখন তাকে বানচাল করে দিতে চাইছে।

এই 'ইস্কো বাঁচাও কমিটি'র সংগ্রাম বাস্তবে কী চরিত্রের ছিল? ইস্কো কর্তৃপক্ষ বারবার পরিষ্কার বলে দেয় যে, কর্মীসংখ্যা কমানো না হলে আধুনিকীকরণ হবে না। আই এন টি ইউ সি, সিটু, এ আই টি ইউ সি, এইচ এম এস, বি এম এস প্রভৃতি শ্রমিক সংগঠনকে নিয়ে যে 'ইস্কো বাঁচাও কমিটি' গড়া হয়েছিল, তারাও সরাসরি কর্তৃপক্ষের কর্মী কমানোর স্কিমে সায় দিয়ে প্রচার করে যে, কর্মী না কমালে ইস্কোর বাঁচা মুশকিল। এই প্রচারের দ্বারা একদিকে নেতারা কর্মীদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে যাতে তারা স্বেচ্ছাবসর নিতে বাধ্য হয়, অন্যদিকে তারাই আবার সকল শ্রমিক-কর্মচারীর চাকরি বহাল রেখে ইস্কোর পুনরুজ্জীবন ঘটাবার দাবিতে 'বার্ষিক ধর্মঘট' ও কিছু 'আন্দোলনের কর্মসূচি' নিয়ে মানুষকে বুঝিয়েছে যে, তারা শ্রমিক-কর্মচারীদের চাকরি রক্ষা করেই ইস্কোর পুনরুজ্জীবনের জন্য চেষ্টা করছে। অথচ, এই কমিটির প্রত্যক্ষ সায় নিয়ে বার্নপুর 'ইস্কো' বাঁচানোর শর্তে কুলটির 'ইস্কো' বন্ধ করা হয়। বার্নপুরেও শ্রমিকসংখ্যা প্রায় অর্ধেক হয়ে গেছে, পুনরুজ্জীবনের কাজ শেষ হতে হতে কর্তৃপক্ষের 'লক্ষ্যমাত্রা' অনুযায়ী আরও বহু কর্মীও বিদায় নেবেন। এমনই 'মহৎ' সংগ্রাম করেছে এই কমিটি! আর, এহেন 'সংগ্রামে'র সাতকাহন গেয়ে এখন সিটু নেতারা বলছেন, 'ইস্কো' সম্প্রসারণের বিরোধিতা করলে সরকারকে 'ব্যবস্থা' নিতেই হবে।

ইস্কোর পুনরুজ্জীবন প্রসঙ্গে আলোচনার সময়ই ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর অন্তর্গত ইস্কো এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সকল কর্মীর চাকরি বজায় রেখে এবং আরও চাকরি সৃষ্টি হওয়ার মতো উপযুক্ত আধুনিকীকরণের প্রস্তাব নিয়ে, ইউ টি ইউ সি-এল এস-এর বর্তমান সাধারণ সম্পাদক কমরেড শংকর সাহা (তদানীন্তন রাজ্য সম্পাদক) এবং এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সম্পাদক কমরেড বাবলা ভট্টাচার্য প্রতিটি ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্বের কাছে গিয়েছিলেন। কেউ কর্ণপাত করেননি। কিন্তু ওই প্রস্তাবের কার্যকারিতা ও যৌক্তিকতা 'সেইল'-এর ডি পি স্বীকারও করেছিলেন। আজ সিপিএমের প্রচারের মিথ্যাচারকে বোঝার জন্যই এ ঘটনা জানা প্রয়োজন।

পুরুষোত্তমপুরের মানুষের এই ন্যায্য সংগ্রামের পাশে দাঁড়িয়েছে এস ইউ সি আই। দলের বর্ধমান জেলা কমিটির সদস্য, বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা কমরেড বাবলা ভট্টাচার্য ও স্থানীয় সংগঠক কমরেড সঞ্জয় চ্যাটার্জী আক্রান্ত গ্রামবাসীদের কাছে ছুটে গিয়েছেন, আদালতেও তাঁরা ধৃতদের সাথে দেখা করেছেন। ১৯ জুন সর্বদলীয় প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসাবে তাঁরা সহকারী জেলাশাসকের কাছে অবিলম্বে গ্রামবাসীদের ন্যায্য দাবিগুলি মেনে নেওয়ার কথা বলেছেন। আন্দোলনের সমর্থনে ও পুলিশি অত্যাচারের প্রতিবাদে এস ইউ সি আই আসানসোলের বিভিন্ন অঞ্চলে পথসভা করেছে এবং সংগঠিত দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের আহ্বান জানিয়েছে।

মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে সিপিএম

একের পাতার পর

পটাশপুর, হলদিয়া প্রভৃতি এলাকা থেকে আনা সমাজবিরোধীর সংখ্যা এক খেজুরিতেই ৫০০-এর বেশি বলে জানা গেছে। সরকারও খেজুরিতে পুলিশ ও আধা সামরিক বাহিনী মিলিয়ে ১০০০-এর বেশি জমায়েত করেছে। আবার হয়ত ১৪ মার্চের পুনরাবৃত্তি ঘটানো হবে। নন্দীগ্রামবাসীর অনমনীয় দৃঢ়তা, তেজ ও সংগ্রামী মানসিকতাকে ভেঙে দিতেই তাদের এই যুদ্ধ পরিকল্পনা। আরও লক্ষণীয় যে, পুলিশের উপর নিজেরাই আক্রমণ চালিয়ে পুলিশকে আহত করে তার দায় আন্দোলনকারী ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির উপর চাপিয়ে সোরগোল ফেলে দেওয়ার পরিকল্পনা সিপিএম নিয়েছিল, জনগণকে তা বিভ্রান্ত করতে পারেনি। এখন তারা আবার নতুন কৌশলের আশ্রয় নিয়েছে। কোনও কোনও সময় পুলিশ সিপিএম-কে নন্দীগ্রামের উপর আক্রমণ চালানো থেকে নিরস্ত করছে, বা কোনও স্থানে জড় হলে তাদের সরিয়ে দিচ্ছে। এ সবের মধ্য দিয়ে পুলিশ 'নিরপেক্ষ' এমন একটা পরিমণ্ডল তৈরি করতে চাইছে, যাতে পরবর্তী সময়ে ১৪ মার্চের মত অপারেশন চালালে রাজ্যে তেমন জনবিক্ষোভ গড়ে না ওঠে। নন্দীগ্রামবাসী একে পুলিশের বিশ্বাসযোগ্যতা সৃষ্টির এক হীন কৌশল বলেই মনে করে।

সিপিএম নেতারা নন্দীগ্রামের আন্দোলন ভাঙতে আরও একটা কৌশল নিয়েছেন। আন্দোলনের সাথে যুক্ত এমন সিপিএমের পুরানো সমর্থকদের টাকা দিয়ে, সুবিধা দিয়ে তাঁরা বশ করতে চাইছেন। এমনকী টাকা দিয়ে আন্দোলনের নেতাদের খুন করার ষড়যন্ত্র পর্যন্ত করছেন। ইতিমধ্যে এই ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে গেছে। ফাঁস হয়েছে তাদের দ্বারাই, যাদের দিয়ে এই অপকর্ম সিপিএম করাতে গিয়েছিল। এই ঘটনা জানিয়ে থানায় ডায়েরি পর্যন্ত হয়েছে।

এর সাথে অত্যন্ত জঘন্য কৌশল সিপিএম নিয়েছে নন্দীগ্রামে দিল্লির ইমাম বুখারিকে পাঠিয়ে। নন্দীগ্রামের আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ভাল সংখ্যক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ রয়েছেন, তাই সিপিএম নেতারা দিল্লির ইমামকে সেখানে পাঠিয়ে তাদের আন্দোলন থেকে সরিয়ে আনার এক সাম্প্রদায়িক ষড়যন্ত্র করেন। কিন্তু আন্দোলনকারী মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ তাদের এই ষড়যন্ত্রের স্বরূপ বুঝে ফেলে। তাই ইমাম এলেও নন্দীগ্রামের মানুষ তাতে বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখায়নি। এমনকী কৌতূহলবশত তাঁকে দেখার জন্যও কেউ নন্দীগ্রামে ভিড় করেনি। বরং যাঁরা নামাজ পড়ার জন্য মসজিদে ছিলেন, সেখানে ইমাম গেলে তাঁকে, ১৪ মার্চের গণহত্যার ঘটনার পর এতগুলো দিন চলে গেলেও, তিনি আসার সময় পেলেন না, অথচ বুদ্ধদেববাবু ডাকতেই চলে এলেন — এমন ধরনের প্রশ্নবাণে জর্জরিত করেছেন। ফলে ইমাম নন্দীগ্রামে বেশিক্ষণ থাকা সমীচীন মনে করেন নি। দ্রুত নন্দীগ্রাম ত্যাগ করেছেন।

একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে গণআন্দোলন কীভাবে সাম্প্রদায়িক ষড়যন্ত্র থেকে জনগণকে রক্ষা করতে পারে তারও একটা দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করল নন্দীগ্রাম।

আত্মরক্ষা ও উন্নয়নের জন্য নন্দীগ্রামে আন্দোলন

একদিকে সিপিএম হার্মাদবাহিনীর আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন, অপরদিকে এলাকার উন্নয়নের দাবিতে আন্দোলন — নন্দীগ্রাম ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি একই সঙ্গে দু'টি আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।

বিপিএল তালিকায় অসঙ্গতি, ১০০ দিনের কাজের অনিশ্চয়তা, প্রয়োজনীয় রেশন কার্ড সরবরাহ না করা, পঞ্চায়েতের গাছ বিক্রির টাকার দুর্নীতি প্রভৃতির প্রতিবাদে এই ডেপুটেশন দেওয়া হয় ১৮ জুন কেন্দ্যামারী গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে। সহস্রাধিক মানুষের এই বিক্ষোভ ডেপুটেশনে প্রতিনিধিত্ব করেন ভবানী প্রসাদ দাস, সফিউর রহমান, দিলীপ দাস, সেখ জাহাঙ্গীর প্রমুখ। এই গ্রাম পঞ্চায়েতটি নন্দীগ্রাম প্রতিরোধ আন্দোলনের সময় বন্ধ থাকেনি, তথাপি এলাকায় উন্নয়নের কাজ হয়নি। পঞ্চায়েত প্রধান দাবিগুলির সঙ্গে সহমত পোষণ করেন এবং তা পূরণের আশ্বাস দেন।

তাছাড়া ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি নন্দীগ্রাম বিডিও অফিসে হাজার হাজার মানুষের জমায়েত করে বিক্ষোভ ডেপুটেশনের কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ডেপুটেশনের গুরুত্বপূর্ণ দাবিগুলি হল ঃ হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদের অধীনতা থেকে নন্দীগ্রামকে বাদ দিতে হবে, হলদিয়া-নন্দীগ্রাম ফেরিঘাটগুলি নন্দীগ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির অধীনে আনতে হবে, বিপিএল তালিকায় দুর্নীতি রোধ করতে হবে, ১০০ দিনের কাজের গ্যারান্টি দিতে হবে, পঞ্চায়েতের এস জি আর ওয়াই স্কিম ও মিড ডে মিল-এ দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে।

ভ্রম সংশোধন

গণদাবী ৫৯ বর্ষ ৪৪ সংখ্যায় 'নন্দীগ্রামে গণহত্যার বিরুদ্ধে আইনজীবীদের প্রতিবাদ' শীর্ষক সংবাদে কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি অনিল কুমার সেনের নামের আগে ভুলক্রমে প্রাক্তন বিচারপতি ছাপা হয়েছে। এই ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত। — সম্পাদক, গণদাবী

যৌনশিক্ষা ঃ রুচি সংস্কৃতি ও নৈতিকতা ধ্বংসের বুর্জোয়া ষড়যন্ত্র

একের পাতার পর

যৌনশিক্ষার কর্মসূচিটি আপাতত স্থগিত রাখা হয়। অন্যান্য রাজ্যেও প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। এস ইউ সি আই, তার ছাত্র সংগঠন ডি এস ও এবং মহিলা সংগঠন এ আই এম এস এস এই প্রতিবাদ আন্দোলনগুলিতে নেতৃত্ব দেয়।

স্কুলে যৌনশিক্ষা চালু করার পক্ষে রয়েছেন যাঁরা তাঁদের মতে, বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে যৌনতা সম্পর্কে কৌতূহল জন্ম নেয়। তাদের এই অনুসন্ধিৎসা মেটাবার সুযোগ না দিয়ে যদি তা তাদের কাছ থেকে আড়াল করে রাখা হয়, তাহলে কিশোর-কিশোরীরাও সঙ্গোপনে, অস্বাভাবিক তথা বিকৃত উপায়ে তাদের কৌতূহল চরিতার্থ করবে এবং অশ্লীল পর্নোগ্রাফিতে আসক্ত হয়ে পড়বে। এ থেকে তাদের রক্ষা করার উপায় হিসাবে এঁরা স্কুলস্তরে যৌনশিক্ষা চালু করে তাদের যৌনস্বাস্থ্য, দায়িত্বশীল যৌন আচরণ এবং যৌন নিপীড়ন থেকে নিজেকে রক্ষা করার উপায়গুলি শেখাবার পক্ষে সওয়াল করেন।

স্কুলস্তরে যৌনশিক্ষা চালু করতে চান যাঁরা, তাঁদের যুক্তিগুলিকে বিশ্লেষণ করে দেখা প্রয়োজন যে, সেগুলি কতটা যুক্তিযুক্ত। এইডস্ রোগটি ছড়িয়ে পড়ার কারণ, কিংবা এইডস্ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত প্রচারের পিছনে থাকা রাজনৈতিক কূটকৌশলের মধ্যে না গিয়েও খোদ সরকারি তথ্যের সাহায্যেই দেখানো যায় যে, যৌনতা সম্পর্কিত অজ্ঞতা এ রোগের প্রসারের কারণ নয়। সরকারি তথ্য অনুযায়ী বলা যায়, বয়ঃসন্ধিতে উপনীত কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে এইডসের প্রাদুর্ভাব বেশি নয় এবং এ'কথাও সত্য নয় যে, কিশোর বয়সী ছেলেমেয়েদের অনৈতিক এবং সাবধানতাহীন যৌন ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত হয়ে পড়ার কারণেই এইডস্ রোগ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। বাস্তবে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এইডস্ ছড়ায় রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে একজনের সংক্রমিত রক্ত অপরের শরীরে প্রবেশ এবং এইড্স রোগীর ব্যবহৃত ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ এবং ছুঁচ উপযুক্তভাবে জীবাণুমুক্ত না করে পুনরায় অন্য রোগীর শরীরে ব্যবহার করার কারণে। এ তথ্য জানা থাকা সত্ত্বেও সরকার ও তার প্রশাসন ডিসপোসেবল সিরিঞ্জ কিংবা ছুঁচের মতো চিকিৎসার উপকরণ পুনর্ব্যবহারের বেআইনি কারবার অবাধে চলতে দিচ্ছে। এই অবৈধ কারবার বন্ধ করতে পারলে এইডসের প্রাদুর্ভাবও নিঃসন্দেহে অনেকটাই কমানো যেত। শুধু তাই নয়, এদেশে এইডসে ভুগে যত লোক মারা যায়;টিবি, আন্ত্রিক এবং ম্যালেরিয়ার মতো অসুখে ভুগে তার চেয়ে অনেক বেশি মানুষের মৃত্যু হয়। অথচ এই সমস্ত অতি সাধারণ ও নিরাময়যোগ্য রোগগুলি দূর করার জন্য কোনও অর্থসাহায্য কিংবা সরকারি তরফে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের চিহ্ন দেখা যায় না। এ'সব থেকে যে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, তা হল, এইডস্ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি গ্রহণের বিষয়ে সরকারের এই অতি উৎসাহের পিছনে সত্যিই কি মানুষের প্রাণ বাঁচানোর ইচ্ছা কাজ করছে, নাকি এ'হল স্কুলস্তরে যৌনশিক্ষা প্রচলনের একটি অজুহাত মাত্র।

দ্বিতীয়ত, এ'কথা সত্য যে, লাম্পট্য, বাধাবন্ধনহীন যৌনজীবন, যৌন অপরাধ ও হিংসা, পর্নোগ্রাফির অবাধ প্রসার, শিশুদের ওপর যৌন নিপীড়ণের ঘটনা আমাদের সমাজে ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। কিন্তু স্কুলস্তরে যৌনশিক্ষার ব্যবস্থা না থাকাই কি এর কারণ? তাই যদি হয়, তাহলে ইউরোপের দেশগুলিতে, যেখানে স্কুলে যৌনশিক্ষা চালু আছে এবং যৌনতার বিষয়গুলি যেখানে অনেক বেশি খোলামেলা, সেখানে এই ধরনের ঘটনা ক্রমবর্ধমান হারে ঘটে চলেছে কেন? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথাই ধরা যাক। সেখানে 'ইউ এস সেক্স ইনফর্মেশন অ্যান্ড এডুকেশন কাউন্সিল' ১৯৬৪ সালেই স্কুলস্তরে যৌনশিক্ষা চালু করেছিল। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে তা চালু করা হয়েছিল, ফল হয়েছিল তার ঠিক বিপরীত। সেখানে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে ক্রমাগত বেড়ে চলা যৌন ক্রিয়াকলাপ, গর্ভপাতের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং যৌনরোগের বিপুল প্রাদুর্ভাবের জন্য অনেক সমাজতাত্ত্বিক স্কুলস্তরে যৌনশিক্ষা প্রচলনকে দায়ী করেন। ২০০০ সালের একটি সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, আমেরিকার ৫৬ শতাংশ মেয়ে এবং ৭৩ শতাংশ ছেলে বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছবার আগেই যৌন ক্রিয়াকলাপে জড়িয়ে পড়ে। সেদেশে যৌনতার বাড়বাড়ন্ত, অপরিণত বয়সে অবাঞ্ছিত মাতৃত্ব এবং যৌন অপরাধ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, বহু স্কুল কর্তৃপক্ষ স্কুল চত্বরের মধ্যেই গর্ভপাতের ক্লিনিক খুলতে বাধ্য হয়েছে এবং ছাত্রছাত্রীদের হাতে গর্ভনিরোধক তুলে দিচ্ছে। ব্রিটেনে, যেখানে ১৯৭৩ সালে যৌনশিক্ষা চালু হয়েছে, সেখানে ১৯৯৮ সালের একটি তথ্য বলছে, সেদেশের ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়স্ক প্রতি ১০০০ জন কিশোরীর মধ্যে ৬৫ জনই অবাঞ্ছিত মাতৃত্বের শিকার হয় এবং এই হার প্রতি বছর ৪ শতাংশ করে বেড়ে চলেছে। ফ্রান্সেও অবাঞ্ছিত মাতৃত্বের বিষয়টি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, সরকার স্কুলগুলিতে গর্ভনিরোধক বিতরণ করার ব্যবস্থা নিয়েছে। সমাজের এই ভয়ানক অসুখ দূর করার উদ্দেশ্য নিয়েই পশ্চিমের দেশগুলি স্কুলস্তরে যৌনশিক্ষা চালু করেছিল। কিন্তু নির্মূল হওয়ার বদলে এই রোগ পশ্চিমী সমাজে আরও জাঁকিয়ে বসেছে।

মূল্যবোধের সঙ্কটই যৌনতা সংক্রান্ত সামাজিক সমস্যার কারণ

মার্কসবাদ দেখায় যে, যে কোন ফেনোমেনন (ঘটনা বা ক্রিয়া) বিচারের সময় পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে তাকে মিলিয়ে বিচার করতে হয়। মার্কসবাদী দ্বন্দ্বমূলক বিচারপদ্ধতি প্রসঙ্গে স্ট্যালিন শিখিয়েছেন, ভাববাদের বিপরীতে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ কোনও ফেনোমেননকে বিচ্ছিন্ন করে এককভাবে বিচার করে না। কারণ সকল ফেনোমেননই অন্যান্য ফেনোমেননের সঙ্গে দ্বন্দ্বসম্পর্কের মধ্যে অবস্থান করে। যৌনশিক্ষার উদ্দেশ্য ও ফলাফল সঠিকভাবে বুঝতে হলে তাই মার্কসবাদী বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে বিচার করতে হবে। দেখতে হবে, কোন্ সামাজিক ও নৈতিক পটভূমিতে কারা কী উদ্দেশ্যে এটা চালু করছে। প্রতিটি দেশের আর্থ-সামাজিক ও নৈতিক বৈশিষ্ট্য পৃথক পৃথক, তাই এক্ষেত্রে অন্য দেশে কোথায় কী হয়েছে তার নজির টেনে প্যারালাল বিচার করতে গেলে ভুল হবে। বিশেষ দেশের বিশেষ বাস্তব পটভূমিতেই এর বিচার করতে হবে। একটি দেশের মানুষের যৌনবিষয়ক সমস্যা সেদেশের আর্থসামাজিক পরিস্থিতি এবং সাংস্কৃতিক-নৈতিক মূল্যবোধের ওপর নির্ভর করে। এ সমস্যা কখনই যৌনবিষয়ক পুঁথিগত জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে না। বস্তুত বর্তমানে ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্যবাদী মূল্যবোধহীনতাই যৌন অসদাচারণের মূলে কাজ করে। কয়েকটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মোট জনসংখ্যার ০.৬১ শতাংশ এইচ আই ভি আক্রান্ত। অথচ আমেরিকারই লাগোয়া দরিদ্র ও ছোট দেশ সমাজতান্ত্রিক কিউবাতে এই রোগী মোট জনসংখ্যার মাত্র ০.১ শতাংশ। ল্যাটিন আমেরিকার অন্যান্য দেশগুলিতে এই হার যথেষ্ট বেশি। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট ইউনিয়ন লেনিন ও স্ট্যালিনের নেতৃত্বে গণিকাবৃত্তিকে সমাজ থেকে মুছে ফেলেছিল। সমাজতন্ত্র গড়ার স্বপ্নে বিভোর রুশ যুবসমাজে সেদিন যৌনজীবন নিশ্চয় ছিল, কিন্তু যৌনসমস্যা ছিল না, অনিয়ন্ত্রিত যৌনতাও ছিল না। তাদের সৃজনশীল যৌবন সমাজতন্ত্র গড়া ও তদনুযায়ী চরিত্র গঠনের মধ্যে ডুবে গিয়েছিল। বিপ্লবের আগে পর্যন্ত চীনে তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতই যৌন-সংক্রমিত রোগের প্রবল প্রকোপ ছিল। বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পর সমাজতান্ত্রিক চীন বিভিন্ন সুপরিকল্পিত আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মসূচি গ্রহণ করার মাধ্যমে ধীরে ধীরে যৌনরোগের সংক্রমণ বন্ধ করে দিতে সক্ষম হয়। নতুন চীন নতুন মানুষ গড়ার যে কর্মযজ্ঞ শুরু করে, সে দেশের যৌবন তার মধ্যেই তৃপ্তি খুঁজে পায়। এমনকী পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর, যাদের লাগাম খুলে দেওয়ামাত্র যৌনবিকৃতির নানা কাহিনী দেশে দেশে গল্পকথায় ছড়িয়ে আছে, সমাজতান্ত্রিক দেশের সেই সেনাবাহিনী ছিল যৌনবিকৃতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। সাম্রাজ্যবাদী সেনাবাহিনীর মতো সোভিয়েট বা চীনের লালফৌজের সঙ্গে, পর্নোগ্রাফির পসরা এবং ভ্রাম্যমান গণিকালয় নিয়ে যেতে হত না। সামরিকবিদ্যার ইতিহাসে লালফৌজের এই নৈতিক মান ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। সমাজতাত্ত্বিকরা লক্ষ্য করেছেন, ১৯৩০-এর দশকের 'মহামন্দা' বা 'গ্রেট ডিপ্রেসনে'র সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যৌনরোগের ওষুধ ব্যবহারের পরিমাণ যেমন দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছিল, তেমনই যৌনরোগীর সংখ্যা বৃদ্ধির হারও দ্বিগুণ হয়েছিল। অন্যদিকে বহু পশ্চিমী ওষুধ বিশেষজ্ঞ দেখিয়েছেন যে, সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট ইউনিয়ন সেদেশ থেকে যৌনরোগ সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করতে সক্ষম হয়েছিল। দেশ থেকে যৌনরোগ নির্মূল করার কর্মসূচি গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গির মূল পার্থক্য কী, কানাডার প্রখ্যাত সাংবাদিক ডাইসন কার্টার তাঁর 'সিন অ্যান্ড সায়েন্স' নামক বইয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, যৌনরোগ নির্মূল করার উপায় হিসাবে মার্কিন বিশেষজ্ঞরা কেবল জৈবিক বিষয়গুলির ওপর জোর দিয়েছেন; অথচ সোভিয়েট বিশেষজ্ঞরা এ ব্যাপারে মূলত জোর দিয়েছেন আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি, জনগণের সাংস্কৃতিক ও নৈতিক মান এবং মানবমনে এগুলির প্রভাবের ওপর। পুঁজিবাদী দুনিয়ায় ব্যক্তিস্বার্থবোধই হল মূল চালিকাশক্তি। যেকোন মূল্যে আত্মতৃপ্তির চেয়ে মহত্তর কিছু, ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়াচিন্তার সীমার বাইরে। খাও-দাও-স্ফূর্তি কর — এই হল তাদের জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য। তাই ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া সমাজে অবাধ যৌনতার বিষয়টিকে যথেষ্ট উৎসাহ দেওয়া হয় এবং এই চিন্তাধারার ওপর ভিত্তি করেই তৈরি হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যৌনশিক্ষা। অন্যদিকে, সমাজতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তিজীবনের তৃপ্তির মূল নিহিত রয়েছে সামাজিক স্বার্থ রক্ষার মধ্যে। সেই সমাজে রুচিবোধসম্পন্ন যৌনতা যেকোন মূল্যে বিনোদন ও তৃপ্তির তুচ্ছ পথে চলে না। তাই সমাজতন্ত্রে যৌনতা সম্পর্কিত সমস্যাকে স্বাস্থ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত সমস্যা হিসাবেই ধরা হয়। এই কারণেই সোভিয়েট ইউনিয়ন গড়ে ওঠার প্রথম যুগের এক মহান শিক্ষাবিদ আন্তন মাকারেংকো স্কুলস্তরে যৌনশিক্ষা প্রচলনের বিরোধিতা করেছিলেন। যৌনতা সংক্রান্ত সমস্যা দূর করার উপায় হিসাবে তিনি সমাজতান্ত্রিক সমাজ পুনর্গঠনের পথে স্কুল-পড়ুয়া শিক্ষার্থী সহ দেশের সমস্ত মানুষের রুচি-সংস্কৃতিগত ও নৈতিক মানের ক্রমাগত উন্নয়নের ওপর জোর দিয়েছিলেন।

যৌন ভ্রষ্টাচার, বাধাবন্ধনহীন অনৈতিক যৌন আচরণ, যৌন অপরাধ, বালক-বালিকাদের ওপর যৌন নিপীড়ণ, পর্নোগ্রাফি ও গণিকাবৃত্তির অবাধ প্রসার শুধু ভারতবর্ষ নয়, গোটা পৃথিবীর প্রতিটি পুঁজিবাদী সমাজে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে। অসংখ্য ছাত্রছাত্রী, যুবক-যুবতী ক্রমশ আরও বেশি করে যৌন কদাচারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে। সংবাদপত্রে প্রতিদিনই ধর্ষণের মতো নৃশংস ঘটনার সন্ধান পাওয়া যায়। শুধু বয়ঃপ্রাপ্তরাই নয়, ক্রমাগত আরও বেশি সংখ্যক কমবয়সী স্কুল-পড়ুয়া ছেলেমেয়ে যৌন অপরাধের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ছে, পর্নোগ্রাফিতে আসক্ত হয়ে যাচ্ছে। কিশোর-কিশোরীদের অবাধ যৌনাচারে ভারত ও অর্থনৈতিকভাবে উন্নত অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশগুলির সমাজবিজ্ঞানী ও চিকিৎসকরা অত্যন্ত চিন্তিত। সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশগুলিতে অপরিণত বয়সে অবাঞ্ছিত মাতৃত্ব ও গর্ভপাতের ঘটনা বেড়েই চলেছে। এরই সাথে সমান তালে চলেছে এইচ আই ভি এবং এইড্সের বিরুদ্ধে প্রচারের ঢক্কানিনাদ। স্বভাবতই পিতামাতা, অভিভাবক সহ সমাজের সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ প্রবলভাবে উদ্বিগ্ন।

সমাজবিজ্ঞানের সমস্ত ছাত্রই জানেন যে, যৌনতা সংক্রান্ত সমস্ত সমস্যাই হল সামাজিক সমস্যা এবং এই সমস্যার মূল নিহিত রয়েছে একটি সমাজের আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে। লক্ষ্য করার বিষয় হল, আজ থেকে পঞ্চাশ-একশ বছর আগে সমাজে এই ধরনের সমস্যার এত প্রাদুর্ভাব ছিল না। যৌনশিক্ষার প্রচলনও যখন হয়নি, আমাদের দেশে সেই স্বদেশী আন্দোলনের যুগে এই দুরবস্থা ছিল না। সেযুগে সকলেই ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়ত না, এটা ঠিক। কিন্তু সমাজের নৈতিক অভিভাবকত্ব যাঁদের হাতে ছিল, সেই রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের নেতাদের চরিত্র ছিল উচ্চ সংস্কৃতির সুরে বাঁধা। তার প্রভাব গোটা সমাজে কলুষের অনুপ্রবেশ অনেকটাই রুখে দিত। আমরা জানি, মানবসংস্কৃতি হল বস্তুগত ভিতের ওপর গড়ে ওঠা উপরিকাঠামো। তাই একটি নির্দিষ্ট সমাজের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করে আলোচনা না করলে ঐ সমাজের সংস্কৃতিগত বিষয়বস্তুর আলোচনা অর্থহীন হয়ে পড়ে। চিন্তা করার ক্ষমতাই মানুষকে পশুর থেকে আলাদা করেছে। চিন্তা করার ক্ষমতাই মানুষকে দিয়েছে ধারণা তৈরি করা ও কল্পনা করার শক্তি। চিন্তা করার এই পদ্ধতির মাধ্যমেই মতাদর্শের জন্ম হয় এবং একটি বিশেষ ধরনের মতাদর্শ থেকে তার পরিপূরক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি, বাসনা, পছন্দ-অপছন্দ ইত্যাদি সবই জন্ম নেয়। মানুষের প্রতিটি খুঁটিনাটি কাজকর্ম নিয়ন্ত্রিত হয় দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা। মনে রাখা দরকার, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে প্রতিটি দৃষ্টিভঙ্গিরই শ্রেণীচরিত্র আছে। তাই যৌনতা সম্পর্কিত ধারণা, কিংবা যৌনতা সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গিরও শ্রেণীচরিত্র আছে, যেটা বুঝতে হবে। সুতরাং স্কুলে যৌনশিক্ষা চালু করার পিছনেও একটি শ্রেণীস্বার্থ অবশ্যই কাজ করছে। একটি বিশেষ ধারণার পিছনে কীভাবে একটি শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গি কাজ করে তা খুঁজে বের করার কাজ সমাজবিজ্ঞানীর। এই শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গির কথা মাথায় রেখেই যৌনতা সম্বন্ধীয় সমস্যাগুলি নিয়ে আমরা আলোচনা করব।

আদিম যুগে, মানুষ যখন উৎপাদন করতে শেখেনি, তখন আচরণের দিক দিয়ে সে ছিল পশুর স্তরে। উৎপাদন করতে শেখার পর সে সমাজ গঠন করতে শিখল এবং উৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশ ও পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্য সমাজও পরিবর্তিত হতে থাকল। দাস সমাজ, সামন্তী সমাজ পার হয়ে সে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় এবং শেষপর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় এসে পৌঁছল। মানবসভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে যে মূল্যবোধগুলি সৃষ্টি হল, সেগুলিরও ক্রমপরিবর্তন হতে থাকল এবং ক্রমেই তা আরও উচ্চমান অর্জন করতে থাকল। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ সমাজপরিবেশ গড়ে তোলা ও বজায় রাখার স্বার্থে যৌনতার প্রবৃত্তি ও সে সংক্রান্ত আবেগের ক্ষেত্রে আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং দায়িত্বশীল সামাজিক আচরণের ধারণা গড়ে উঠল। আদিম সমাজের যৌননীতি ছিল অনেকটা প্রাকৃতিক, তৎকালীন আদিম সমাজকে রক্ষা করার প্রয়োজনের পরিপূরক। সামন্তী সমাজে

চারের পাতায় দেখুন

যৌনতা সংক্রান্ত সামাজিক সমস্যার কারণ মূল্যবোধের সঙ্কট

তিনের পাতার পর

ধর্মীয় মূল্যবোধ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। সামন্তী সমাজ ভেঙে পুঁজিবাদী সমাজ গড়ে ওঠার সময়ে, অর্থাৎ পুঁজিবাদের প্রগতিশীলতার যুগে রেনেসাঁ আন্দোলন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র ও মূল্যবোধের জগতে এক বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন নিয়ে এল। ধর্মীয় মূল্যবোধের স্থান গ্রহণ করল বুর্জোয়া মানবতাবাদ। বিশেষত সমাজে নারীর মর্যাদা ও নারী স্বাধীনতা সংক্রান্ত ধারণা আমূল বদলে দিল বুর্জোয়া মানবতাবাদ। জন্ম নিল নতুন ধরনের মূল্যবোধ, নীতি-সংস্কৃতির উচ্চ মান, রুচির নতুন ধারণা এবং নতুন ধরনের মানবিক সম্পর্ক।

সামন্তী স্বৈরাচার, ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং তমসাচ্ছন্নতার বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রামে বুর্জোয়া মানবতাবাদী মূল্যবোধ নতুন প্রেরণা জোগাল। প্রগতিশীল বুর্জোয়া সমাজ ব্যক্তি স্বাধীনতা, নারীমুক্তি এবং প্রেমের স্বাধীনতার ধ্বজা তুলে ধরল। বুর্জোয়া মানবতাবাদ শেখাল, ভালবাসার অর্থ হল স্বাধীন চিন্তার অধিকারী দু'জন ব্যক্তির মনের মিলন। এই নতুন মূল্যবোধ শেখাল, প্রকৃত ভালবাসা নিছক শারীরিক আকর্ষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; তার সঙ্গে যুক্ত থাকে যত্ন, স্নেহ ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ। প্রকৃত ভালবাসা দু'টি নরনারীকে সামাজিক দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করে। এইসব নতুন মূল্যবোধ এবং নৈতিকতার ধারণা যৌনতার ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলতে এবং মানুষের যৌন আবেগকে নিয়ন্ত্রিত করতে শুরু করল। সেই সময়কার শক্তিশালী সামাজিক আন্দোলনও মানুষের যৌন আচরণের ক্ষেত্রে আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং দায়িত্বশীলতার বিকাশে সাহায্য করেছিল। নরনারীর প্রেমের সৌন্দর্য সেদিন রূপ পেয়েছিল মানবতাবাদী সাহিত্য ও শিল্পকলার মধ্য দিয়ে। এই যুগে এসে যৌনতা নিছক একটি জৈবিক প্রবৃত্তি হিসাবে থাকল না। একজন মানুষ যে দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা পরিচালিত হয়, তার যৌনতাও তার দ্বারা প্রভাবিত হয়।

শুধুমাত্র জৈবিক বিষয় নয়, মানুষের নৈতিকতা ও তার সংস্কৃতি যৌনতার ওপর প্রভাব ফেলে। এই দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে আজকের দিনের যৌনতা সম্পর্কিত সমস্যা যদি আমরা বিচার করি, তাহলে বর্তমান ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদের সঙ্কটগ্রস্ত সংস্কৃতি ও নৈতিকতার দিকটিকে অবশ্যই হিসাবে নিতে হবে। নাহলে এই আলোচনা অর্থহীন হয়ে পড়বে। আমাদের বুঝতে হবে, আজকের দিনের জরাগ্রস্ত মরণাসন্ন পুঁজিবাদ, প্রথম রেনেসাঁর যুগের প্রগতিশীলতা হারিয়ে ফেলেছে। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা আজ চূড়ান্ত সঙ্কটগ্রস্ত। নির্মমভাবে সাধারণ মানুষকে শোষণ করেই আজ এ ব্যবস্থা টিকে আছে। বুর্জোয়া মানবতাবাদী মূল্যবোধ আজ সম্পূর্ণ নিঃশেষিত। তা আজ শাসকশ্রেণীর শোষণ চালাবার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। পুঁজিপতিশ্রেণী আজ শ্রমিক বিপ্লবের ভয়ে চরম ভীত। পুঁজিবাদের সঙ্কট যতই তীব্র হচ্ছে, বিপ্লব ভীত পুঁজিপতিশ্রেণী ততই গড়ে-ওঠা গণ-আন্দোলনগুলিকে চরম দমন-পীড়ন চালিয়ে স্তব্ধ করার চেষ্টা করছে। শুধু তাই নয়, একই সঙ্গে জাত-পাত-ধর্ম-বর্ণের ভিত্তিতে দাঙ্গা লাগিয়ে একদিকে যেমন পুঁজিবাদ তার জুলুম-শোষণের ওপর থেকে মানুষের দৃষ্টি সরিয়ে দিতে চাইছে এবং জনগণের ঐক্য ভাঙবার চেষ্টা করছে, অন্যদিকে চূড়ান্ত নোংরা সংস্কৃতি সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে মানুষের সংগ্রামী মানসিকতাকে ভেতর থেকে ধ্বংস করার চক্রান্ত করছে। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র এবং শিক্ষাব্যবস্থা, যা মানুষের চিন্তাধারা গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়, সমস্ত দেশেই পুঁজিপতিশ্রেণী তার ওপর আক্রমণ নামিয়ে আনছে। দীর্ঘদিন আগে কার্ল মার্কস দেখিয়েছিলেন যে, পুঁজিবাদ সমস্ত কিছুকে, এমনকী মানুষের সযত্নলালিত সম্পর্কগুলিকে পর্যন্ত কেনাবেচার পণ্যে পরিণত করে। বর্তমান বিশ্বায়নের স্লোগানের আড়ালে শিল্পকলা, সাহিত্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি প্রতিটি বিষয়ই বাজারের পণ্যে পরিণত হয়েছে। যে সংস্কৃতি মানুষকে ভোগবাদী করে তোলে, আদিম প্রবৃত্তির তাৎক্ষণিক সন্তুষ্টিকরণের লক্ষ্যে তাকে ঠেলে দেয়, সামাজিক সমস্যার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখার শিক্ষা দেয়, সামাজিক দায়িত্ব অস্বীকার করতে শেখায়, সাহস ও দৃঢ়তা কেড়ে নেয়, পুঁজিপতিশ্রেণী সেই সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রসারই চায়। সাম্রাজ্যবাদ শুধু রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কিংবা সামরিক আক্রমণ চালায় তাই নয়, মানুষের সাংস্কৃতিক জগতেও সে আগ্রাসন চালায়। শিক্ষা ও প্রচারমাধ্যমের ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে সাম্রাজ্যবাদ মানুষের নীতি-নৈতিকতা ধ্বংস করছে এবং সমাজের সাংস্কৃতিক কাঠামোটিকেও বিনষ্ট করছে, জন্ম দিচ্ছে মানবিকতাহীন, আত্মকেন্দ্রিক, যান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন ভোগবাদী মানুষের।

ভারতবর্ষে পুঁজিবাদী শাসনের প্রভাব

আমাদের দেশের দিকে তাকালে আমরা দেখি, ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর ৬০ বছরের শাসনে আমাদের দেশ দুর্দশার চরমে পৌঁছেছে। সর্বাত্মক অর্থনৈতিক সঙ্কটের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভয়ঙ্কর অনাহার ও বেকারত্বের সমস্যা। অর্থনৈতিক বৈষম্য আকাশ ছুঁয়েছে। এশিয়ার সবচেয়ে ধনী লোকের বাস এখানে, আবার সরকারি হিসাবেই এদেশের ২৬ কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে। ভারতের অস্ত্রভাণ্ডারে পারমাণবিক অস্ত্র আছে, নানা ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র আছে; চাঁদে মানুষ পাঠাবার কথাও ভাবা হচ্ছে। অথচ রাষ্ট্রসংঘের মানব উন্নয়ন সূচকের হিসাবে বিশ্বের ১৭৭টি দেশের মধ্যে ভারতবর্ষের স্থান ১২৭ নম্বরে। এই অবস্থায় মানুষের অসন্তোষ যত বাড়ছে, ভারতবর্ষের পুঁজিপতিশ্রেণী, বিশ্ব পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের সুরে সুর মিলিয়ে জনসাধারণের ওপর আরও নির্মম অত্যাচার নামিয়ে আনছে, অর্জিত গণতান্ত্রিক অধিকারগুলিকে পদদলিত করছে। এরই সঙ্গে তারা গোটা সমাজে নোংরা বুর্জোয়া সংস্কৃতির প্রভাব ছড়িয়ে দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে। পত্রপত্রিকা ও সিনেমার মাধ্যমে পর্নোগ্রাফির অবাধ প্রসার ঘটানো হচ্ছে। টিভি চ্যানেল ও সংবাদপত্রের পাতাগুলি ভরিয়ে দেওয়া হচ্ছে অশ্লীল বিজ্ঞাপনে, রাস্তার দু'ধারের হোর্ডিংগুলিতে চলছে নোংরা বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি। খবরের কাগজগুলিতে খ্যাত-অখ্যাত ব্যক্তিদের যৌন ব্যভিচারের রসাল গালগল্পের ছড়াছড়িতে ভরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এইডস নিয়ন্ত্রণের নামে প্রচারমাধ্যম যেকোন সময়ে, যেকোন জায়গায়, যেকোন মানুষের সাথে যৌনতায় লিপ্ত হওয়ার বিষয়টিকে অবাধে সমর্থন করছে। সরকারি বিজ্ঞাপনে বলা হচ্ছে, সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে এটাই স্বাভাবিক, শুধু এইডস্ এড়াতে কনডোমের মতো সাবধানতা অবলম্বন করলেই হল। এইভাবে মানুষের ধ্বংসোন্মুখ যৌন নৈতিকতাকে ঘুচিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র চলছে। ফল হিসাবে, যুবসমাজ সহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে ড্রাগ ও মদের ব্যাপক প্রসার ঘটছে। সমাজে মূল্যবোধের যে কাঠামোটি আজও অবশিষ্ট রয়েছে, পুঁজিপতিশ্রেণী তা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে মেতেছে। আমাদের নেতা, শিক্ষক ও পথপ্রদর্শক, এ যুগের মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ বহুদিন আগেই দেখিয়েছেন, "একটা জাতি না খেতে পেলেও শত অত্যাচারের মধ্যেও ... মাথা তুলে কোমর সিধা করে দাঁড়াতে পারে, যদি সেই জাতির নৈতিক বল অবশিষ্ট থাকে।" বুর্জোয়াশ্রেণী এ'কথা খুব ভালভাবেই জানে এবং ঠিক সে কারণেই তারা নোংরা ক্ষয়িষ্ণু সংস্কৃতি ছড়িয়ে জাতির নৈতিক চরিত্র সম্পূর্ণ ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে মেতেছে। এই পথেই জনসাধারণকে দুর্বল করে, তার লড়াই করার ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে, পুঁজিবাদ উচ্ছেদ করার লক্ষ্যে গড়ে ওঠা সংগ্রামী শক্তিকে তারা নষ্ট করে দিতে চায়। এই উদ্দেশ্যে তারা সাধারণ মানুষকে শিক্ষার আওতা থেকেও দূরে ঠেলে দিতে চায়। তারা জানে, প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হলে মানুষ তার দুর্দশার মূল কারণ খুঁজে বের করবে এবং তা উচ্ছেদ করার লক্ষ্যে পুঁজিপতিশ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত করবে। তাই একদিকে তারা মানুষকে শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে সত্যে উপনীত হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করছে, অন্যদিকে তারা শিক্ষার বিষয়বস্তু এমনভাবে নির্ধারণ করছে যাতে শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে গড়ে না উঠে, বিজ্ঞানের কারিগরী বিদ্যার দিকটিই কেবল শিখতে পারে এবং মূল্যবোধের কাঠামোটিই যাতে গড়ে উঠতে না পারে। এই উদ্দেশ্যেই তারা স্কুলস্তরে যৌনশিক্ষা চালু করার চেষ্টায় মেতেছে, যাতে করে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা পরিণত মানসিকতা অর্জন করার আগেই যৌনতার মতো অত্যন্ত শক্তিশালী আদিম প্রবৃত্তির প্রবল আকর্ষণের খপ্পরে পড়ে যায় এবং নৈতিক মেরুদণ্ডের জোর হারিয়ে অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার শক্তি হারিয়ে ফেলে।

কিশোর-কিশোরী ও যুবকদের মধ্যে যৌনতা সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার ভয়াবহতায় অভিভাবক সমাজ আজ উদ্বিগ্ন। তাঁদের সেই উদ্বেগ নিরসনের অজুহাতে পুঁজিপতিশ্রেণীর সেবাদাস সরকার আজ স্কুলস্তরে যৌনশিক্ষা চালু করার উদ্যোগ নিয়েছে। এই শিক্ষার মাধ্যমে তারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শিক্ষার্থীদের শেখাবে যে, নীতি-নৈতিকতার তোয়াক্কা না করে যৌন প্রবৃত্তির তাৎক্ষণিক সন্তুষ্টিবিধানের মধ্যে দোষের কিছু নেই, কেবল 'সাবধানতা' অবলম্বন করলেই হল। মূল্যবোধের ভিত্তিতে নৈতিক চরিত্রের অধিকারী মানুষ গড়ার যে শিক্ষার স্বপ্ন ভারতবর্ষের মনীষীরা দেখেছিলেন, তা দু'পায়ে মাড়িয়ে বর্তমান শাসক সম্প্রদায় শিক্ষা-ব্যবস্থায় নোংরামির অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে যুবসমাজকে ব্যভিচারের পথে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার ষড়যন্ত্র করছে। এভাবেই তারা এদেশের যুবসমাজকে সংগ্রামের পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়।

পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী অবক্ষয়ী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম গড়ে তুলুন

নৈতিকতা ও মূল্যবোধের বর্তমান দিনের সঙ্কট প্রসঙ্গে কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, "পুরনো ধর্মীয় মূল্যবোধ অনেক আগেই নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছে এবং বুর্জোয়া মানবতাবাদী মূল্যবোধও আজ নিঃশেষিত প্রায় — অথচ সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবী মতাদর্শ ও নতুন মূল্যবোধ দেশের রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও সমাজজীবনে আজও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে না পারার ফলে আদর্শ ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে, তারই ফলে দেশের নৈতিকতার ক্ষেত্রে এই সর্বাত্মক সঙ্কট।"

সুতরাং মূল্যবোধের যে সঙ্কট আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি, তা আসলে পুঁজিবাদেরই সঙ্কট। শাসক পুঁজিপতিশ্রেণীর বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কার্যকলাপের কারণেই কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে যৌন বিপথগামিতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ফলে, পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদীদের শ্রেণী-ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করে তাকে পরাস্ত না করা পর্যন্ত আমরা এই সমস্যার হাত থেকে কোনমতেই রেহাই পেতে পারি না।

স্বভাবতই যে প্রশ্নটি উঠে আসে সেটি হ'ল, কীভাবে এই নোংরা সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতির আগ্রাসন, জীবনযাত্রার ধরন এবং তাদের ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপকে পর্যুদস্ত করা যায়। এ প্রশ্নের স্পষ্ট ও একমাত্র উত্তর হ'ল, কেবলমাত্র উচ্চতর সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ও মতাদর্শের দ্বারাই এই অবক্ষয়িত সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতির মোকাবিলা করা সম্ভব। কেবলমাত্র এই নতুন ও উচ্চতর মূল্যবোধই মানুষের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়ে তুলে নোংরা বুর্জোয়া সংস্কৃতি, পর্নোগ্রাফি এবং বিকৃত যৌনতার বিরুদ্ধে ঘৃণার সৃষ্টি করতে পারে। ফলে, নতুন উন্নত চিন্তা, ধারণা এবং সংস্কৃতির ভিত্তিতে জীবনের সর্বদিক পরিব্যাপ্ত করে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের জন্ম দেওয়া আজ আবশ্যিক কর্তব্য হিসাবে দেখা দিয়েছে।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, উচ্চতর সংস্কৃতি ও নীতি-নৈতিকতার একটা পাল্টা স্রোত আমরা কীভাবে সৃষ্টি করতে পারি? আমরা জানি, অবিচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে উন্নততর সমাজসৃষ্টির প্রয়োজনে যে সংগ্রাম গড়ে ওঠে, সেই সংগ্রামই উচ্চতর মূল্যবোধের জন্ম দেয়। এই কারণেই অবক্ষয়ী সামন্তী সমাজের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামের দিনে, রেনেসাঁ আন্দোলনের যুগে ন্যায়-নীতি-মূল্যবোধের উচ্চ ধারণা নিয়ে গড়ে উঠেছিল বুর্জোয়া মানবতাবাদ। আমরা এও দেখেছি, আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম তরুণ-যুবকদের মধ্যে সামাজিক দায়িত্ববোধ, নৈতিক সাহস, নিষ্ঠা ও আত্মবলিদানের প্রেরণা সৃষ্টি করে কীভাবে মহান সংগ্রামে আত্মনিয়োগে তাদের উদ্বুদ্ধ করেছে। জাতীয়তাবাদ এবং জাতীয় মুক্তির আকাঙ্ক্ষা সে'সময় প্রগতিশীল মতাদর্শের ভূমিকা পালন করে স্বাধীনতা আন্দোলনের পথনির্দেশিকা হিসাবে কাজ করেছিল এবং উচ্চতর নীতি-নৈতিকতা, আদর্শ ও মূল্যবোধের জন্ম দিয়েছিল। কিন্তু সেই জাতীয়তাবাদ স্বাধীনতার পর শাসক বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে গণআন্দোলন দমন করে শ্রেণীশাসন শোষণ বজায় রাখার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বুর্জোয়া মতাদর্শ আজ চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়েছে। এ থেকে আজ আর কোনও মহান চরিত্রের জন্ম হতে পারে না। সমস্ত রকম সামাজিক অবিচার, নিপীড়ন ও স্বৈরাচারের জন্ম দিয়ে চলেছে যে অবক্ষয়ী পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, আজকের দিনে সেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করার সংগ্রামই কেবলমাত্র পারে উচ্চতর সংস্কৃতি, নৈতিকতা ও মূল্যবোধের জন্ম দিতে। পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের শ্রেণী আক্রমণ প্রতিহত করতে গেলে উন্নত নীতি-আদর্শ ও নির্দিষ্ট মতাদর্শের ভিত্তিতে শ্রেণীসংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে। এ যুগের মহান আদর্শ মার্কসবাদ, যা বিজ্ঞানসম্মত দ্বান্দ্বিক বিচারধারা অনুসরণ করে সমস্ত বিজ্ঞানের বিজ্ঞান হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে, কেবলমাত্র সেই মার্কসবাদের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা উন্নত নীতি-আদর্শই পারে একাজ করতে। যৌনতা সহ জীবনের সর্বক্ষেত্রে পথনির্দেশিকার ভূমিকা পালন করে মার্কসবাদ। পুঁজিবাদ উচ্ছেদ করার সংগ্রাম গড়ে ওঠার সাথে সাথে সমাজে এই নতুন মূল্যবোধেরও জন্ম হচ্ছে এবং কেবলমাত্র পুঁজিবাদবিরোধী সংগ্রামে অংশগ্রহণের দ্বারাই আমরা এই উচ্চতর নীতি-আদর্শ-মূল্যবোধে অনুপ্রাণিত হতে পারি এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে নেমে আসা সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণকে প্রতিহত করতে পারি।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আজকের সমাজে কিশোর ও যুবসমাজের মধ্যে যৌনতা সংক্রান্ত সমস্যা, যা নিয়ে পিতামাতা ও অভিভাবকরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন, স্কুলে যৌনশিক্ষা চালু করে সে সমস্যার সমাধান করা যাবে না। বরং এই শিক্ষা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যৌন আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়ে তুলে তাদের আদিম প্রবৃত্তির দাসে পরিণত করবে। এই সমস্যা একমাত্র তখনই সমাধান করা সম্ভব হবে, যখন উচ্চ নীতি- আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে তাদের সক্রিয়ভাবে যুক্ত করা যাবে। যেসব মানুষ নিজেদের সন্তানসন্ততিসহ সমগ্র দেশের যুবসমাজের জন্য একটি সুস্থ সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে তুলতে চান, তাঁদের সকলের কাছে আমাদের আহ্বান — আপনারা এই পচা-গলা অবক্ষয়িত পুঁজিবাদী সমাজ উচ্ছেদ করার সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করুন। প্রত্যক্ষভাবে এই

সাতের পাতায় দেখুন

‘নেভা নদী হয়তো উল্টো বইতে পারে, কিন্তু লেনিনগ্রাদ জার্মানদের কাছে আত্মসমর্পণ করবে না’

[জুন মাস। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘূর্ণাবর্তে ১৯৪১ সালের এই জুন মাসেই হিটলারের ১৭০ ডিভিশন বিশাল নাৎসি সেনাবাহিনী অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর, তার দু-হাজার মাইল দীর্ঘ সীমান্তে। যুদ্ধের শুরুতে জার্মানবাহিনী ঝটিকা আক্রমণ হেনে সোভিয়েতের অভ্যন্তরে বহুদূর ঢুকে যায় দৈনিক ৪০ মাইল গতিতে।

উত্তরে আরও এগুতে হলে লেনিনগ্রাদকে ধ্বংস করতেই হবে; তাই নাৎসিবাহিনী পশ্চিম, দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক থেকে ঘিরে ধরেছিল লেনিনগ্রাদকে। ৮ সেপ্টেম্বর থেকেই বাস্তবে শুরু হয়েছিল লেনিনগ্রাদের ইতিহাসখ্যাত ৯০০ দিনের অবরোধ যুদ্ধ। এর মোকাবিলায় বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম তো ছিলই, সেই সঙ্গে অবরুদ্ধ লেনিনগ্রাদে বিপুল ধ্বংস ও মৃত্যুর মাঝখানেও সোভিয়েত জনগণের যে মানবিক গুণাবলী বিকশিত হয়ে উঠেছিল — তারই দু'টি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আজও অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রেরণা হয়ে কাজ করবে মনে করেই প্রকাশ করা হল।]

‘পৃথিবীর বুক থেকে পিটার্সবার্গকে মুছে দাও’ — এই ছিল হিটলারের নির্দেশ। তার দাম্ভিক উক্তি ঃ ‘সোভিয়েত ইউনিয়নের পরাজয়ের পরে ঐ বিরাট শহরাঞ্চলের আর কোনও প্রয়োজন থাকবে না। ফিনল্যান্ডও তার নয়া সীমান্তের এত কাছে ঐ শহর থাকার প্রয়োজন দেখছে না।... ঐ শহরের চারপাশে নিশ্ছিদ্র অবরোধ গড়ে তোলা দরকার। সমস্ত ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র থেকে গুলিবর্ষণে এবং অবিরাম বোমাবর্ষণে শহরটিকে ছাই করে দেওয়া দরকার।’...

সেই শত্রুকে সমুচিত জবাব দেওয়ার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল লেনিনগ্রাদের মানুষ। নবগঠিত নগর সুরক্ষা ইউনিটগুলি দেশের সৈন্যবাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি করল। বিরাট সংখ্যক নারী ও শিশু এবং কলকারখানা ও শিল্পসামগ্রী স্থানান্তরিত করা হ'ল। বাকি কারখানাগুলো পরিণত হ'ল যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণ ও মেরামতির কেন্দ্রে। অধিকাংশ সক্ষম শ্রমিক যুদ্ধক্ষেত্রে চলে যাওয়ায় বৃদ্ধ, নারী এবং কিশোর-কিশোরীরা কারখানায় তাদের শূন্যস্থান পূরণ করল।

লেনিনগ্রাদ রক্ষার বীরত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও শহরের অবস্থা ক্রমাগত খারাপ হতে লাগল। বোমাবর্ষণের ফলে চমৎকার শহরটি পরিণত হ'ল ধ্বংসস্তূপে। সুন্দর সুন্দর পার্ক এবং নদীবাঁধগুলো অবিরাম বোমার আঘাতে ক্ষতলাঞ্ছিত হয়ে গেল। শহরে খাদ্যাভাব, ঘর গরম রাখার জ্বালানি নেই, বিদ্যুৎকেন্দ্র ও পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা স্তব্ধ। ১৯৪১-৪২ এর শীতকালটাও ছিল অস্বাভাবিক শীতল — লেনিনগ্রাদ শহরবাসীরা সেই ঠাণ্ডায় তাদের ভাঙাচোরা বাসস্থানের মধ্যে জমে যেতে লাগল। দৈনিক রুটির বরাদ্দ কমে দাঁড়াল মাত্র ১২৫ গ্রাম। মাখন, মাংস, চিনি দুষ্প্রাপ্য। খাদ্যাভাব, হিমশীতল তাপমাত্রা এবং অবিরাম বোমাবর্ষণে নগরবাসীর মৃত্যুহার ঊর্ধ্বমুখী।

’৪২ সালের জানুয়ারিতে ব্যাপক সংখ্যায় মানুষ মারা যেতে লাগল। প্রায়ই দেখা যেত পথচলতি মানুষ রাস্তাতেই পড়ে যাচ্ছে, আর উঠছে না। সন্ধ্যায় মৃতদেহগুলি স্লেজে চাপিয়ে কবরখানায় নিয়ে যাওয়া হত। কিন্তু বরফে জমে যাওয়া কঠিন মাটিতে কবর খোঁড়া ছিল অসম্ভব, তাই দেহগুলি বরফেই পড়ে থাকত। অনেক আত্মীয় শারীরিক দুর্বলতার জন্য মৃতদেহ কবরখানায় টেনে নিয়ে যেতে পারত না, সেই মৃতদেহগুলো পড়ে থাকত বাড়ির সামনেই।

দেখতে দেখতে রুটির বরাদ্দ সর্বনিম্ন পরিমাণে এসে দাঁড়াল। এই অবস্থায় সামরিক পরিষদ সিদ্ধান্ত নিল — শহরে খাদ্য ও জ্বালানি সরবরাহ করা হবে লাদোগা হ্রদের মাধ্যমে জলপথে। দীর্ঘ ৯০০ দিনের অবরোধকালে সেটিই ছিল যোগাযোগের একমাত্র পথ — লেনিনগ্রাদবাসীরা যাকে বলত ‘জীবন পথ’। বরফ জমার ঋতু এসে পড়ায় জলপথ পরিবহন বন্ধ হয়ে গেল। তখন শুরু হল লাদোগা লেকের জমা বরফের ওপর দিয়ে শীতকালীন যাত্রাপথ নির্মাণ।

এই সড়ক নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলল প্রবল তুষারপাত এবং ঝোড়ো হাওয়ার মধ্য দিয়ে — কখনও কখনও এই আবহাওয়ায় পথ নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। গাড়িচালকরা দিনের পর দিন একটানা কাজ করে চলল। আর নির্মীয়মাণ এই পথের ওপর চলল জার্মানদের বিরামহীন বিমান আক্রমণ এবং কামানের গোলাবর্ষণ। সেইজন্য কর্মীবাহিনী কাজ করত মূলত রাত্রে, মাঝে মাঝে ঝলসে ওঠা ফ্ল্যাশলাইটের আলোয়। জার্মানরা চলমান মোটরগাড়ির সারির ওপর নিয়মিত প্রচণ্ড গোলা-গুলি বর্ষণ করত। ফলে মালবাহী গাড়িগুলি গিয়ে পড়ত বোমার আঘাতে তৈরি গর্তের মধ্যে।

‘জীবন পথে’র একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন গাড়িচালক ম্যাক্সিম ভারদোশ্লেব। ১৯৪২ সালের গোড়ার দিকে তিনি লাদোগা হ্রদের পূর্ব উপকূল থেকে নিয়মিত মালপত্র নিয়ে আসতেন অবরুদ্ধ মানুষদের জন্য। একদিন তিনি দেখলেন যে, তাঁর ট্রাকে ময়দার বস্তার পরিবর্তে প্লাইউডের বাক্স বোঝাই করা হচ্ছে এবং বাক্সগুলির গায়ে লেখা রয়েছে ‘বীর লেনিনগ্রাদের শিশুদের জন্য’। এ ব্যাপারে তাঁকে অবাক হতে দেখে সরবরাহের দায়িত্বপ্রাপ্ত কমান্ডার জানালেন, বাক্সগুলিতে আছে কমলালেবু, জর্জিয়া থেকে পাঠিয়েছে লেনিনগ্রাদের শিশুদের জন্য নববর্ষের উপহার হিসেবে। ট্রাক ছাড়তে সেই কমান্ডার চিৎকার করে ড্রাইভারকে বললেন, ‘দেখো, ওগুলো যেন ঠিক সময়ে পৌঁছায়।’ ট্রাক ভাঙাচোরা রাস্তা ধরে ছুটে চলল লেনিনগ্রাদের দিকে। হ্রদের ওপর দ্রুত সন্ধ্যা নেমে এল, চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল উজ্জ্বল চাঁদের আলো — যা মোটেই শুভ লক্ষণ নয়। কারণ নাজিরা শুধু দিনের বেলায় নয়, আজকাল রাতেও রাস্তা লক্ষ্য করে বোমাবর্ষণ করে। এবং সে রাত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না।

‘২০ কিলোমিটার যাওয়ার পর দু'টি মেসারস্মিটস্ যুদ্ধবিমান আমাকে আক্রমণ করল’ — স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে ম্যাক্সিম ভারদোশ্লেব বলেছেন, ‘তীক্ষ্ণ শিসের মতো শব্দ করে বিমান দু'টি উঠে গেল ওপরে, পিছন ফিরে এসে আবার আক্রমণ করল — লক্ষ্য ট্রাকের পশ্চাদ্‌ভাগ এবং ড্রাইভারের কেবিনটি। আমি গাড়ির গতি বাড়ালাম, কমালাম, ডাইনে ঘোরালাম, বাঁয়ে ঘোরালাম — আমার চারপাশে তখন বুলেটের আঘাতে আঘাতে অসংখ্য বরফ কুঁচি ছড়িয়ে পড়ছে। আমি পাগলের মতো গাড়ি চালাতে লাগলাম...আমার গাড়ির কেবিনটি বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে, সামনের কাচটি ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে গেছে। হঠাৎ আমার মনে হ'ল একটা কিছু যেন আমার বাহুতে আঘাত করল এবং সেখানটা জ্বালিয়ে দিল। অবিরাম রক্তক্ষরণ আটকানোর জন্য আমি হাতটা উপরদিকে তুলে রাখলাম এবং প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলাম যেন জ্ঞান না হারাই। গাড়ির ভাঙা রেডিয়েটার থেকে মেঘের মতো বাষ্প বেরোচ্ছে, ফলে আমি সামনের দিকে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। ইচ্ছা করলে আমি লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে পারি এবং বেঁচে যেতে পারি। কিন্তু শিশুদের জন্য পাঠানো কমলালেবুগুলোর কী হবে? তাই আমি ভাবলাম, না, আমাকে যথাস্থানে পৌঁছোতেই হবে।’

সেই নির্ভীক ট্রাকচালক অবশেষে কোনমতে গন্তব্যস্থলে পৌঁছান এবং দেখা যায় তাঁর গাড়িতে ৪৯টা বুলেটের গর্ত। বিনিময়ে লেনিনগ্রাদের শিশুরা সেদিন হাতে পেয়েছিল জর্জিয়া প্রজাতন্ত্র থেকে তাদের জন্য পাঠানো নববর্ষের উপহার সেই কমলালেবু।

৯০০ দিনের অবরোধকালে লেনিনগ্রাদ অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করেছে। কিন্তু ভয়াবহ নিঃস্বতা কিংবা বিপুল প্রাণহানি লেনিনগ্রাদবাসীদের মনোবলকে এতটুকু দুর্বল করতে পারেনি। জনগণ লড়াই চালিয়ে গেছে, প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের কারখানায় কাজ করেছে, অসুস্থদের সেবা করেছে, বৈজ্ঞানিক গবেষণা কর্মসূচি চালিয়ে গেছে। এমনকী গ্রীষ্মকালে তারা শহরের পার্ক এবং রাস্তায় রাস্তায় সব্‌জির চাষ করেছে। ‘কোন অগ্নিপরীক্ষাই আমাদের মনোবলকে ভাঙতে পারবে না’ — তারা বলত। তারা বলত, ‘এই শহর শত্রুর কাছে কিছুতেই আত্মসমর্পণ করবে না। নেভা নদী হয়তো উঁচুর দিকে বইতে পারে, কিন্তু এই শহর নাৎসিদের কাছে মাথা নত করবে না।’

নাৎসি অবরোধের সমস্ত ভয়ঙ্কর প্রতিকূলতাকে সাহসের সঙ্গে মোকাবিলা করে লেনিনগ্রাদ নিজের জায়গায় অটল থেকেছে এবং হার মানতে অস্বীকার করেছে। পরবর্তীকালে মার্শাল গিয়র্গি জুকভ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, ‘রণক্ষেত্রে এমন শৌর্য এবং আভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষায় এমন বীরত্ব যুদ্ধের ইতিহাসে ইতিপূর্বে আর কখনও দেখা যায়নি — যা দেখিয়েছে লেনিনগ্রাদের অনমনীয় রক্ষীবাহিনী।’

শহরের প্রতিরক্ষায় প্রাত্যহিক কঠিন পরিশ্রম, কল-কারখানাগুলোকে সচল রাখা এবং আহতদের শুশ্রূষা করা ছাড়াও লেনিনগ্রাদবাসীরা কবিতা লিখেছে, সঙ্গীত রচনা করেছে। সেই সময়েই সেখানে বসে রাশিয়ার বিশিষ্ট সুরকার দমিত্রি শাস্তাকোভিচ রচনা করেছেন তাঁর বিখ্যাত সপ্তম সিম্‌ফনি — যা তৎক্ষণাৎ নেভা তীরবর্তী অপরাজেয় সেই শহরের কাছে এক আলোড়নসৃষ্টিকারী সঙ্গীত হিসাবে বন্দিত হয়েছে।

যুদ্ধের প্রথম দিকে সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান ‘ফিলহারমনিক সোসাইটি’র অন্যান্য সদস্যদের মতো শাস্তাকোভিচও শহর ছেড়ে নিরাপদ জায়গায় চলে যাওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি বারবার স্থানীয় নিয়োগকেন্দ্রগুলিতে গিয়ে দাবি করেছিলেন যে, তাঁকে যেন সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো হয়। কিন্তু তাঁর সমস্ত আবেদন খারিজ করে দেওয়া হয়। তিনি তখন তাঁর বন্ধুদের সাথে শহরের বাইরে পরিখা খননের কাজে হাত লাগান। বেসামরিক রক্ষীবাহিনী ‘মিলিশিয়া’তে যোগ দেওয়ার প্রচেষ্টাও যখন ব্যর্থ হ'ল, তখন তিনি স্থানীয় অগ্নিনির্বাপক স্কোয়াডে যোগ দেন। আপৎকালীন আশ্রয়স্থলের ছাদে ডিউটি দেওয়ার সময় তিনি জার্মানদের ফেলা আগুনেবোমা নেভানোর কাজ করতেন। সেই কঠিন অগ্নিপরীক্ষার দিনগুলিতেই তিনি তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি ‘সপ্তম সিম্‌ফনি’ রচনার সিদ্ধান্ত নেন।

১৯৪১-এর ২০ সেপ্টেম্বর এক বেতার বার্তায় দমিত্রি শাস্তাকোভিচ বলেন, ‘ঘণ্টাখানেক আগে আমি আমার নতুন সিম্‌ফনির দ্বিতীয় অংশ রচনা শেষ করলাম।... একথা আপনাদের কেন বললাম? কারণ যাঁরা রেডিওতে আমার কথা শুনছেন, সেই সমস্ত লেনিনগ্রাদবাসীকে আমি জানাতে চাই যে, জীবন ঠিকই বয়ে চলেছে এবং আমরা আমাদের কর্তব্য পালন করে চলেছি।...’

সপ্তম সিম্‌ফনি পরিবেশন করার ক্ষেত্রে লেনিনগ্রাদ রেডিওর বাদ্যযন্ত্রীর সংখ্যা তখন খুবই সামান্য। সেই স্বরলিপির জন্য প্রয়োজন ৮০ জন বাদ্যযন্ত্রী — রেডিও স্টেশনে পাওয়া গেল মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে, যাঁরা তখনও দুর্ভিক্ষ এবং শত্রুর বুলেটের হাত থেকে কোনক্রমে বেঁচে আছেন। তখন রেডিও সম্প্রচারের মাধ্যমে দেশের শিল্পীদের আমন্ত্রণ জানানো হ'ল ঐ অর্কেস্ট্রায় যোগ দেওয়ার জন্য। রণক্ষেত্রের ইউনিট কমান্ডারদের নির্দেশ দেওয়া হল বাদ্যযন্ত্রীদের স্পেশাল পাস দিয়ে যেন ছেড়ে দেওয়া হয়। সেই পাসে লেখা ছিল — যুদ্ধের ডিউটি থেকে তাদের ছাড় দেওয়া হল দমিত্রি শাস্তাকোভিচের সপ্তম সিম্‌ফনিতে অংশগ্রহণের জন্য। প্রকাশিত হ'ল যুদ্ধের মধ্যেও সৃষ্টির ব্যাকুলতা।

অবশেষে সকলে একত্রিত হলেন প্রথম রিহার্সালের জন্য। যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য তাঁদের হাত হয়ে গেছে কর্কশ, অপুষ্টিতে তাঁরা কাঁপছেন। তবুও তাঁরা বাদ্যযন্ত্রগুলোকে সজোরে আঁকড়ে ধরলেন, যেন সেগুলিই তাঁদের জীবন। সম্ভবত সেটাই ছিল সংক্ষিপ্ততম রিহার্সাল, মাত্র ১৫ মিনিটের। শীর্ণ, দুর্বল যন্ত্রশিল্পীরা ঐটুকু সময়ই দাঁড়াতে পেরেছিলেন এবং বাজাতে পেরেছিলেন। পরিচালক কার্ল এলিয়াসবার্গ প্রাণপণে চেষ্টা করছিলেন যাতে তিনি ভেঙে না পড়েন। তখনই তিনি বুঝতে পারলেন, এই অর্কেস্ট্রাই পারবে ঐ সিম্‌ফনি পরিবেশন করতে।

৯ আগস্ট, ১৯৪২ — নাজিদের দ্বারা অবরুদ্ধ লেনিনগ্রাদে আর একটি দিন। বাদ্যযন্ত্রীরা দৃশ্যতই উজ্জীবিত, তৎপরতার সঙ্গে প্রস্তুতি নিচ্ছেন সপ্তম সিম্‌ফনির প্রথম প্রকাশ্য অনুষ্ঠানের জন্য। কার্ল এলিয়াসবার্গ পরবর্তীকালে সেই স্মরণীয় দিনটির কথায় লিখেছেন ঃ ‘ফিলহারমনিক হলের সমস্ত ঝাড়লণ্ঠনগুলি উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে। হলে শিল্পী, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ্‌দের ঠাসাঠাসি ভিড়। সৈন্যবাহিনীর বহু মানুষও সেখানে রয়েছেন, যাদের অনেকেই সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে এসেছেন।’...

পরিচালকের শীর্ণ শরীরে সুদৃশ্য জ্যাকেটটি ঢিলেঢালাভাবে ঝুলছে। তিনি মঞ্চে পা দিলেন, তাঁর হাতের ছড়িটি কাঁপছে। পরমুহূর্তেই সেটি ওপরে উঠল এবং গোটা হল ভরে গেল শিহরণ জাগানো এক সুন্দর ঐকতানে, শাস্তাকোভিচের জীবনের শ্রেষ্ঠ সুরসৃষ্টিতে। সুরের শেষ মূর্ছনা যখন ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল, তখন দেখা গেল ক্ষণিকের এক নিস্তব্ধতা। তারপরেই গোটা জায়গাটা আক্ষরিক অর্থেই ফেটে পড়ল হাততালির বজ্রধ্বনিতে। সকলেই দাঁড়িয়ে উঠেছে, চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে — আনন্দ এবং গর্বের অশ্রুধারা...।

বাদ্যশিল্পীরা তাদের এই সাফল্যে উদ্দীপ্ত হয়ে একে অপরকে উল্লাসে জড়িয়ে ধরতে লাগলেন, যেমন করে এক বিরাট যুদ্ধে জয়লাভ করে সৈন্যরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করে।...

জনৈক জার্মান সেনা রেডিওতে সেই কনসার্ট শুনে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। সে বলেছিল ঃ ‘যখন আমি দুর্ভিক্ষপীড়িত লেনিনগ্রাদের রেডিওতে শাস্তাকোভিচের সপ্তম সিম্‌ফনি শুনলাম তখনই বুঝে গেলাম, আমরা কোনদিনই এই শহর দখল করতে পারব না। সেটা বুঝেই আমি আত্মসমর্পণ করলাম।’...

জার্মানরা কোনদিনই সেই শহর দখল করতে পারেনি। ১৯৪৪ সালের জানুয়ারি মাসে লাল ফৌজ পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে সেই ৯০০ দিনব্যাপী ভয়ঙ্কর অবরোধ থেকে লেনিনগ্রাদকে মুক্ত করে এবং রাশিয়ার উত্তরাঞ্চলের এই রাজধানীকে সোভিয়েতের নির্ভীকতা এবং অপরাজেয়তার চিরস্থায়ী প্রতীকে পরিণত করে।

[রেভলিউশনারি ডেমোক্র্যাসি (সেপ্টেম্বর '০৬) পত্রিকায় প্রকাশিত লুইবঙ জারেভস্কায়ার ‘দি সিজ অফ্ লেনিনগ্রাদ’ রচনা থেকে]

চাকরিই নেই, অথচ সংরক্ষণ নিয়ে রাজস্থানে আগুন জ্বলল

শিক্ষায় ও চাকরিতে সংরক্ষণকে কেন্দ্র করে দেশে আবারও ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষের আগুন জ্বলল, যা ক্ষতির বিচারে সাম্প্রদায়িক হানাহানির চেয়ে কম কিছু নয়। গত মে মাসের শেষ সপ্তাহে রাজস্থানে গুজ্জর ও মীনা — এই দুই জনগোষ্ঠী সংরক্ষণকে কেন্দ্র করে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে জড়িয়ে যায়। ৩০ জন মানুষ প্রাণ হারায়, আহত হয় শত শত। কয়েক হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি ধ্বংস হয়। এই সংঘর্ষের ফলে গোটা এলাকা জুড়ে পারস্পরিক সন্দেহ, অবিশ্বাস, আর ভয়াবহ আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। কখন কোন দিক থেকে আক্রমণ আসে কোনও ঠিক নেই। এই আতঙ্কের মধ্যেই চলেছে পুলিশের নির্বিচারে গ্রেপ্তার ও বিভিন্ন ধারায় মামলা দায়ের। সব মিলিয়ে গোটা এলাকা জুড়ে চলে এক ত্রাসের পরিস্থিতি।

কিন্তু কেন এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হল? সুদীর্ঘকাল ধরে পাশাপাশি বসবাস করা দুই জনগোষ্ঠী কেন চরম ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষে জড়িয়ে গেল? সংরক্ষণ নিয়ে দাঙ্গা আমাদের দেশে নতুন নয়। গত বছর সিপিএম সমর্থিত কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রের ইউপিএ সরকার উচ্চশিক্ষায় অন্যান্য পশ্চাৎপদ-শ্রেণীর (ওবিসি) জন্য ২৭ শতাংশ আসন সংরক্ষণ ঘোষণা করলে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা সংরক্ষণের পক্ষে ও বিপক্ষে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং পরস্পরের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে জড়িয়ে যায়। সংরক্ষণ নিয়ে এহেন বিভেদমূলক আন্দোলনের এক বছর অতিক্রান্ত হতে না হতেই আবার রাজস্থানে এই ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষ ঘটল।

ফলে যে প্রশ্নটি গভীরে ভেবে দেখা দরকার, তাহল, বর্ণগত, জাতপাতগত বিভেদ সত্ত্বেও স্বাধীনতা আন্দোলনে যে ভারতীয় জনগণ মোটামুটি ঐক্যবদ্ধ ছিল, ব্রিটিশ শাসকদের চেষ্টা সত্ত্বেও খোলাখুলি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়নি, সেই জনগণ আজ খোলাখুলি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছে কেন? আজ স্বাধীন ভারতে কেন এই বিভেদ, দ্বন্দ্ব; কেন এই সংঘর্ষগুলি ঘটছে? কখনো ধর্মকে কেন্দ্র করে, কখনো সংরক্ষণকে কেন্দ্র করে কেন দাঙ্গা লাগছে?

এবারে রাজস্থানে যে গুজ্জর-মীনা সংঘর্ষ হল, এর পেছনে রয়েছে এক গভীর ষড়যন্ত্র। রাজস্থানে গুজ্জররা ওবিসি তালিকাভুক্ত। আর মীনারা ১৯৫০ সাল থেকে তফসিলি উপজাতি (এস টি) তালিকাভুক্ত। গুজ্জরদের দাবি, তাদের এস টি তালিকাভুক্ত করতে হবে। ওবিসি কোটায় গুজ্জরদের সংরক্ষণ থাকা সত্ত্বেও কেন তারা এই দাবি তুলছে? আর কেনইবা মীনারা গুজ্জরদের এস টি তালিকায় অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে?

সংরক্ষণের নেপথ্যে জাতপাতের ভিত্তিতে ভোট রাজনীতি

এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর পেতে হলে ইতিহাসের কয়েকটি পাতা ওল্টানো দরকার। ওবিসি কোটা সৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতটি যাঁদের মনে আছে তাঁরা জানেন, ১৯৮৯-৯০ সালে ভিপি সিংহের নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রের রাষ্ট্রীয় মোর্চা সরকার মণ্ডল কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য (ওবিসি) সংরক্ষণ ঘোষণা করেছিল। কেন করেছিল? এর উদ্দেশ্য কি ছিল পিছিয়ে-পড়া মানুষের প্রতি দরদবোধ? আপাতদৃষ্টিতে অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য সংরক্ষণের ঘোষণাকে 'সামাজিক ন্যায়বিচার' মনে হলেও যদি ক্রমাগত কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করা না যায় এবং সরকারের কর্মসঙ্কোচন নীতি প্রতিহত করা না যায়, তাহলে বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে, এই সংরক্ষণ বাস্তবে অর্থহীন। সরকার চাকরি দেওয়ার লক্ষ্যেই যদি এই সংরক্ষণ আনত, তাহলে কর্মসঙ্কোচন নীতি নিয়ে চলত না। এই সংরক্ষণ ঘোষণার পেছনে অন্য উদ্দেশ্য ছিল।

রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের প্রতি যারা নজর রাখেন তাঁরা জানেন ১৯৮৯-৯০ সাল নাগাদ বিজেপি রামরথযাত্রার মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের আগুন জ্বালিয়ে হিন্দু ভোটব্যাঙ্ক তৈরি করার যে ষড়যন্ত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তারই পাল্টা হিসাবে দলিত ভোটব্যাঙ্ক তৈরি করার উদ্দেশ্যে ভিপি সিংহ ও মোর্চা সরকারের শরিকরা অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য সংরক্ষণ ঘোষণা করে। এই ঘোষণার পরই সংরক্ষণের পক্ষে ও বিপক্ষে আন্দোলন শুরু হয় এবং ক্রমে তা রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে পরিণত হয়। এখানে যে বিষয়টি লক্ষ করার তা হল, কী বিজেপি, কী রাষ্ট্রীয় মোর্চার শরিক দলগুলি — কেউই জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি সমাধানের ভিত্তিতে জনসমর্থন নিয়ে ভোটে জেতার পথে না গিয়ে জাতপাতের বিভাজন ঘটিয়ে ক্ষমতা দখল করতে বা ক্ষমতায় টিকে থাকতে এইভাবে আগুন নিয়ে খেলছে। একের বিরুদ্ধে অপরকে উস্কে দিয়ে এই ধরনের দাঙ্গা ঘটাচ্ছে। তাতে হাজার হাজার মানুষের প্রাণ গেলেও এদের কোনও অনুশোচনা নেই। বরং হাজার হাজার মানুষের জীবনের বিনিময়ে ক্ষমতায় যাওয়ার পথ প্রশস্ত হয় বলে এদের মুখে থাকে তৃপ্তির হাসি। এই ক্ষমতালিপ্সুরাই সংরক্ষণের নামে দরদী সেজে মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ভোট রাজনীতির লক্ষ্যেই সংরক্ষণে ওবিসি কোটার সৃষ্টি। এবং পরবর্তীকালে ভোট রাজনীতির স্বার্থেই ওবিসি তালিকা ক্রমাগত বাড়িয়ে নানা সম্প্রদায়কে অন্তর্ভুক্ত করাও হতে থাকে। ১৯৯৯ সালে লোকসভা নির্বাচনে জাঠদের ভোট পাওয়ার লক্ষ্যে বিজেপি ওবিসি কোটায় জাঠদের অন্তর্ভুক্ত করে। জাঠদের অন্তর্ভুক্তির ফলে নির্দিষ্ট ওবিসি কোটায় সংরক্ষণের অংশীদারের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় স্বভাবতই নিজেদের সুযোগ কমে যাবার আশঙ্কায় রাজস্থানের গুজ্জররা দাবি তোলে তাদেরকে এস টি তালিকাভুক্ত করতে হবে। যে গুজ্জররা ১৯৩১ সালে জনগণনার সময় দাবি তুলেছিল তাদের উচ্চবর্ণের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, সেই গুজ্জররা আজ যখন দাবি তুলছে তাদেরকে নিম্নবর্ণের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না, চাকরির প্রশ্নে তারা কী গভীর আশঙ্কায় রয়েছে। এই অবস্থায় এস টি তালিকাভুক্ত করার দ্বারা সমস্যা মিটবে কি মিটবে না, এই দাবি সঠিক কি বেঠিক, সঠিক না হলে কেন নয়, ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা না করে বিজেপি ভোটের আশু লক্ষ্যে গুজ্জরদের দাবি সমর্থন করে এবং ২০০৩ সালে রাজস্থান বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিশ্রুতি দেয় যে, তারা ক্ষমতায় এলে গুজ্জরদের এস টি স্বীকৃতি দেবে।

এই প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরই এস টি তালিকাভুক্ত মীনারা তাদের সুযোগ কমে যাওয়ার আশঙ্কায় তার বিরোধিতা করতে থাকে। রাজস্থানে মীনারা গুজ্জরদের থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ। ফলে গুজ্জরদের এস টি স্বীকৃতি দিলে পাছে মীনারা বিরুদ্ধে চলে যায় — এই আশঙ্কায় বিজেপি প্রতিশ্রুতি পালনে বিরত থাকে। এদিকে গুজ্জরদের মধ্যে বিজেপির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ বাড়তে থাকায় বিজেপি গুজ্জরদের দাবি বিবেচনার জন্য মন্ত্রী পর্যায়ের একটি সাব-কমিটি গঠন করে। গুজ্জর জনগণ এরপর আশা করেছিল হয়তো কিছু হবে। কিন্তু ৯ মাস পার হয়ে গেলেও প্রতিশ্রুতি পালনে কোন সদর্থক ভূমিকা দেখতে না পেয়ে গুজ্জররা আন্দোলনে নামে। এই আন্দোলনে বিজেপি সরকারের পুলিশ বর্বরোচিত আক্রমণ নামিয়ে আনে এবং গুলি করে ১১ জনকে হত্যা করে। এই আক্রমণ গুজ্জরদের বিক্ষোভে ঘৃতাহুতি দেয়। ইতিমধ্যে কয়েকটি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে পর্যুদস্ত কংগ্রেস আসন্ন রাজস্থান বিধানসভা নির্বাচনে জয়ের লক্ষ্যে গুজ্জরদের বিক্ষোভে ইন্ধন যোগায়। ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকার তীব্র সমস্যায় পড়ে। আওয়াজ ওঠে, বসুন্ধরা রাজে সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে। পরিস্থিতি এমন জায়গায় যায় যে, বিজেপির গুজ্জর এম এল এ-রাও দলীয় নির্দেশ অমান্য করে আন্দোলনে নেমে যায়।

এই অবস্থায় গুজ্জরদের আন্দোলন মোকাবিলা করতে মীনাদের উস্কে দেওয়া হয় এই বলে যে, গুজ্জরদের এস টি তালিকাভুক্ত করলে তাদের প্রাপ্য অংশে টান পড়বে। ফলে মীনারা গুজ্জরদের এস টি স্বীকৃতি না দেবার দাবিতে মারমুখী আন্দোলন শুরু করে। অতিদ্রুত এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষের আগুন রাজস্থানের সীমানা ছাড়িয়ে পার্শ্ববর্তী দিল্লি, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।

এই সমস্ত ঘটনাক্রম বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথমত, কংগ্রেস-বিজেপি প্রভৃতি দলগুলি ভোটের সংকীর্ণ স্বার্থে এমনকী জাতপাতের আগুন জ্বালিয়ে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা লাগাতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না। তাতে সাধারণ মানুষের জীবন, সম্পত্তি নষ্ট হলেও, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে হিংসা, অবিশ্বাস সৃষ্টি হলেও এরা কুণ্ঠিত নয়। দ্বিতীয়ত, স্বাধীনতার পর যে সমস্ত দল বা দলগুলি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল বা আছে তাদের শাসনে জনজীবনে অর্থনৈতিক সমস্যা, বেকার সমস্যা এমন তীব্র রূপ নিয়েছে যে, সংরক্ষণের সামান্য সুযোগ পাওয়ার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণে তালিকাভুক্ত করার দাবি ক্রমাগত বাড়ছে। ইতিমধ্যে গুজ্জররা এই দাবিতে উত্তাল হয়ে উঠেছে। একই দাবি তুলছে কাশ্মীরের পাহাড়ী সম্প্রদায়ের মানুষেরাও, আসামের রাজবংশীরাও। যাঁরা এই দাবি তুলছেন তাঁদের ভেবে দেখতে হবে, সরকার এই তীব্র বেকার সমস্যা সমাধানে কেন চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ। কেন বেকার সমস্যা কমার পরিবর্তে দিন দিন বাড়ছে। সমস্যা এরকম থাকলে সংরক্ষণ পেলেই কি চাকরি হবে? তাই যদি হত, তাহলে যারা সংরক্ষণ তালিকাভুক্ত, তাদের মধ্যেও অর্থনৈতিক সমস্যা কেন এমন তীব্ররূপ ধারণ করছে।

মূল সমস্যা পুঁজিবাদ

এটা আজ দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, ভারতে যে পুঁজিবাদী শাসনব্যবস্থা কায়েম রয়েছে তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণামে তীব্র অর্থনৈতিক সঙ্কট ধর্ম-বর্ণ-জাতি-উপজাতি নির্বিশেষে সমস্ত সাধারণ মানুষকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। অন্যদিকে বাড়ছে পুঁজিপতিদের পুঁজির পাহাড়। পুঁজিবাদী শোষণ-বঞ্চনার পরিণামে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা আজ তলানিতে এসে ঠেকেছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা মানুষের ক্রয়ক্ষমতাকে নিঃশেষিত করে দিয়ে যে তীব্র বাজার সঙ্কট সৃষ্টি করেছে তারই ফলে ব্যাপক সংখ্যায় নতুন নতুন শিল্প গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে তীব্র প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছে শুধু নয়, চালু শিল্পগুলি পর্যন্ত বন্ধ হচ্ছে। সারা দেশে লক্ষ লক্ষ কলকারখানা বন্ধ। শুধু পশ্চিমবঙ্গেই ৫৬ হাজার ছোট-বড় মাঝারি কলকারখানা বন্ধ হয়েছে। ১৫ লক্ষেরও বেশি শ্রমিক ছাঁটাই হয়েছে। ক্রমাগত লকআউট, ছাঁটাই চলছে।

কেন্দ্রীয় সরকারি রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৯৭ সালে সরকারি ক্ষেত্রে কর্মচারী ছিল ১ কোটি ৯৫ লক্ষ ৫৯ হাজার। ২০০৩ সালে এই সংখ্যাটা কমে হয় ১ কোটি ৮৫ লক্ষ ৮০ হাজার। অর্থাৎ ৬ বছরে চাকরির সুযোগ কমে গিয়েছে ৯ লক্ষ ৭৯ হাজার শ্রমিক-কর্মচারির।

কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরিতে ১৯৯১ সালে তফসিলি জাতির গ্রুপ 'এ'র থেকে গ্রুপ 'ডি' পর্যন্ত কর্মচারী ছিল ৬ লক্ষ ৪১ হাজার ৯২০। ২০০৩ সাল আসতে আসতেই সংখ্যাটা কমে দাঁড়ায় ৫ লক্ষ ৪০ হাজার ২২০। অর্থাৎ এস সিদের চাকরি সুযোগ ১ লক্ষ ১ হাজার ৭০০ কমে যায়।

তপসিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রেও পদ বিলোপ করা হয়েছে। ২০০১ সালে তপসিলি উপজাতিভুক্ত সব গ্রুপ মিলিয়ে কর্মচারী ছিল ২ লক্ষ ৩৭ হাজার ৫১। ২০০৩ সালে সংখ্যাটা কমে হয়েছে ২ লক্ষ ১১ হাজার ৩৪৫ জন। অর্থাৎ তপসিলি উপজাতিভুক্ত কর্মচারীর সংখ্যা কমেছে ২৫ হাজার ৭০৬ জন। কেন কমল? এর পেছনে রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের ছাঁটাই বা পদ বিলুপ্তি নীতি। পঞ্চম বেতন কমিশন এবং একাদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ হল সরকারি ক্ষেত্রের ৩০ শতাংশ পদ বিলুপ্ত করা, এক বছর শূন্য থাকা পদগুলি তুলে দেওয়া, শূন্যপদগুলির দুই-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ৬৬ শতাংশ নিয়োগ না করা এবং গ্রুপ ডি পদে স্থায়ী নিয়োগ একেবারেই বন্ধ করা। এই অবস্থায় চাকরির সংরক্ষণ বাস্তবে প্রহসন নয় কি?

শোষিত মানুষের ঐক্য ভাঙার বুর্জোয়া ষড়যন্ত্র

চাকরির ক্ষেত্রে এই আক্রমণ এস টি, এসসি, ওবিসি, হিন্দু, মুসলিম ইত্যাদি বিচার করে আসেনি, আক্রমণ নেমে এসেছে নির্বিচারে সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের উপর। চাকরির সুযোগ হরণ করার সরকারি এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন না করে যদি এসটি, এসসি বা ওবিসি কোটায় ক্রমাগত অন্তর্ভুক্তির দাবি করা হয় অথবা দাবি করা হয় কোটার মধ্যে আর কোনও সম্প্রদায়কে অন্তর্ভুক্ত করা চলবে না — তাহলে চাকরির সুযোগ কেড়ে নেওয়ার এই আক্রমণ কি বন্ধ হবে? দ্বিতীয়ত, সম্প্রদায়গতভাবে আলাদা আলাদা লড়লেও কি তা সফল হবে? এই অবস্থাকে প্রতিহত করতে হলে প্রয়োজন সমস্ত অংশের শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যবদ্ধভাবে সরকারের বিদায়নীতি, ছাঁটাই নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলা। এবং এই আন্দোলন সমস্যা জর্জরিত মানুষ আজ হোক কাল হোক, ঐক্যবদ্ধভাবে গড়ে তুলবেই। এই আশঙ্কা থেকে পুঁজিপতিশ্রেণী ও তার সেবাদাস দলগুলি সমস্যা জর্জরিত সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে তাদের শোষণ-শাসন কায়েম রাখতে একদিকে যেমন ধর্ম-বর্ণ-জাত-পাত ইত্যাদিকে খুঁচিয়ে তুলছে, অন্যদিকে চাকরি দিতে পারবে না জেনেও বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য শিক্ষায় ও চাকরিতে সংরক্ষণ ঘোষণা করে শোষিত মানুষের ঐক্য ভাঙছে।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয়ও লক্ষণীয়। যদি চাকরির সুযোগই না থাকে, যদি সরকারি নীতির পরিণামে চাকরির সুযোগ বৃদ্ধির পরিবর্তে ক্রমাগত কমতে থাকে, তাহলে সংরক্ষণের কী অর্থ থাকে? তাহলে সকলের জন্য চাকরি চাই — এটাই কি সঠিক দাবি নয়? সকলকে চাকরির সুযোগ দিতে শ্রমনির্ভর শিল্প চাই — এই দাবিই কি ঐক্যবদ্ধভাবে তোলা উচিত নয়? সমস্যা যেখানে সকলের, সেখানে শুধু আমার সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষণ আমি দাবি করি, আর কোন সম্প্রদায়ের কথা ভাবি না — এই দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে যত মারমুখী আন্দোলনই পরিচালনা করা হোক না কেন, সেই আন্দোলনকে ভাঙতে অন্য সম্প্রদায়কে লেলিয়ে দেওয়া কি শাসকশ্রেণীর পক্ষে সহজ হবে না? সকলের জন্য চাকরির দাবি উঠুক, এটা বুর্জোয়াশ্রেণী চায় না। বুর্জোয়াশ্রেণী চায় এবং মাঝে মাঝে উস্কেও দেয় যে, চাকরিতে সম্প্রদায়গত সংরক্ষণের দাবি উঠুক। কারণ এতে বুর্জোয়াদের সুবিধা। এর দ্বারা বুর্জোয়ারা জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিতে সক্ষম হয়, অথচ তার দায় সরকারের উপর সরাসরি পড়ে না। বুর্জোয়াশ্রেণীর এই ষড়যন্ত্রে কি কোন অংশের শোষিত মানুষের পা দেওয়া উচিত?

সাতের পাতায় দেখুন

সংরক্ষণে লাভবান হয়েছে কারা ?

ছয়ের পাতার পর

এর দ্বারা বাস্তবে শোষিত সম্প্রদায়ের কারোরই লাভ হবে না। বরং এই সংঘর্ষ বন্ধ করার নামে নির্মম দমন পীড়ন, মিথ্যা মামলা, জরিমানা, জেল-হাজত ইত্যাদি শাস্তির খড়্গ নেমে আসবে — যেমন এসেছে সাম্প্রতিক গুজ্জর-মীনা সংঘর্ষের ক্ষেত্রে। এটাই হল সরকারের 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' নীতির নির্মম প্রয়োগ।

সংরক্ষণে লাভবান সংরক্ষিত সম্প্রদায়ের ধনীরাই

বৈষম্যের পথে যাঁরা সংরক্ষণের সুযোগ পেলেন, বা যাঁরা সংরক্ষণের সুযোগ না পেয়ে নিজেদের বঞ্চিত মনে করছেন, তাঁদের কয়েকটি বিষয় ভেবে দেখতে হবে। ভেবে দেখতে হবে, যে সম্প্রদায় সংরক্ষণের সুযোগ পেল সেই সম্প্রদায়ের সকলেই কি শিক্ষার বা চাকরির সুযোগ পেয়েছে, বা পাচ্ছে ? যদি না পেয়ে থাকে, তাহলে তার কারণ কী।

সংরক্ষণ সত্ত্বেও শিক্ষার বা চাকরির কী হাল, তা দেখতে উদাহরণ হিসাবে রাজস্থানের এস টিদের কথাই ধরা যাক। রাজস্থানে এস টিদের মধ্যে মীনারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। এর পরেই রয়েছে ভীলরা। এছাড়া গারাসিয়া, সাহরিয়া, দামোর, ধামকা প্রভৃতি ছোট ছোট গোষ্ঠীও রয়েছে। সংরক্ষণের ৬০ বছর পরেও তারা কি সকলেই শিক্ষার সুযোগ পেয়েছে? দিল্লি স্কুল অব ইকনমিক্সের সমাজতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপিকা নন্দিনী সুন্দর সম্প্রতি গুজ্জর-মীনা সংঘর্ষ সম্পর্কে এক নিবন্ধে দেখিয়েছেন, মীনাদের মধ্যে সাক্ষরতার হার মাত্র ৫২.২ শতাংশ, ভীলদের মধ্যে ৩৫.২ শতাংশ এবং সাহরিয়াদের ক্ষেত্রে ৩৪.২ শতাংশ। অর্থাৎ এস টিদের অর্ধেকের বেশি অংশকে নিজের নাম লেখা পর্যন্ত শেখানো হয়নি। যারা সাক্ষর হয়েছে তাদের মধ্যে কত অংশ গ্র্যাজুয়েট? মীনাদের মাত্র ৩.৫ শতাংশ গ্র্যাজুয়েট। অন্যদের ক্ষেত্রে এই হাল আরও করুণ। ভীলদের মধ্যে গ্র্যাজুয়েট ০.৯ শতাংশ, গারাসিয়াদের মধ্যে ০.৬ শতাংশ আর সাহরিয়াদের মধ্যে ০.১ শতাংশ। সংরক্ষণ সত্ত্বেও এই যদি শিক্ষার হাল হয়, তাহলে জনসংখ্যার কত নগণ্য শতাংশ চাকরির সুযোগ পেয়েছে তা সহজেই অনুমেয়। এই তথ্য কি প্রমাণ করে সংরক্ষণ হলেই চাকরি মিলবে?

তাহলে সংরক্ষণ সত্ত্বেও এস টিদের মধ্যে গ্র্যাজুয়েট এত নগণ্য অংশ কেন? এম কে বাসিন এবং সম্পা নাগ পরিচালিত একটি সমীক্ষা রিপোর্টও দেখিয়েছে, ভয়াবহ দারিদ্র্যই এর মূল কারণ। রাজস্থানে এস টিদের মধ্যে ৫০ শতাংশই কৃষি শ্রমিক এবং ৪০ শতাংশ ছোট মাঝারি নানা স্তরের কৃষক। এই কৃষি শ্রমিকদের সারা বছর কাজ থাকে না। ফলে কোনক্রমে দু'মুঠো খেয়ে বেঁচে থাকাই এদের বড় সমস্যা। চাইলেই কি এরা লেখাপড়ার জন্য বিদ্যালয়ে যেতে পারে? আর যারা কৃষক তারাও একদিকে কৃষি উপকরণের মূল্যবৃদ্ধিতে এবং অন্যদিকে কৃষি ফসলের ন্যায্য দাম না পেয়ে বিপর্যস্ত। এই অবস্থায় এস টিদের মধ্যে যাদের আর্থিক সঙ্গতি আছে তারাই শিক্ষায় এবং চাকরিতে সংরক্ষণের সুযোগ পাচ্ছে। গরিব এস টিরা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই পড়ে আছে শুধু নয়, অন্ধকারের অতলে ক্রমেই তলিয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় সংরক্ষণের জন্য গরিব এস টিদের আহ্লাদিত হওয়ার কী আছে?

ভারত সরকারের মানবসম্পদ বিকাশ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০০৩-০৪ সালে মাধ্যমিক শিক্ষার বিষয়ে প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এস টিদের ৭৩.১৩ শতাংশ, এসসিদের ৭৯.২৫ শতাংশ এবং ওবিসির ৬২.৬৯ শতাংশ ছাত্র দশম শ্রেণীর পর আর পড়াশুনা করতে পারে না। অভাবের কারণে এস টি, এসসি বা ওবিসির এই যে বেশির ভাগ অংশ পড়াশুনা থেকে ছিটকে যাচ্ছে তাদের কাছে সংরক্ষণ থাকা বা না থাকার কী অর্থ আছে? বাস্তবে সংরক্ষণ করে দিয়ে শাসকশ্রেণী এস টি, এসসি বা ওবিসি'র মধ্যে একটা ধনী সুবিধাভোগী গোষ্ঠী তৈরি করছে, যারা শাসকশ্রেণীর হীন রাজনীতির হাতিয়ারে পরিণত হচ্ছে। একটু লক্ষ করলেই দেখা যায়, এস টি, এসসি বা ওবিসির মধ্যে এই সুবিধাভোগী ধনী অংশ উক্ত সম্প্রদায়ের গরিবদের ন্যায়সঙ্গত কোন আন্দোলনের সাথী হতে চায় না। এখানে তাদের সম্প্রদায়গত আবেগ বা ভালবাসা কাজ করে না। কিন্তু সংরক্ষণ সামান্য একটু কমালেই এস টি, এসসি বা ওবিসির সুবিধাভোগী ধনিক গোষ্ঠী সম্প্রদায়গত আবেগকে সুড়সুড়ি দিয়ে গরিবদের আন্দোলনে নামিয়ে দেয়। অথচ, সংরক্ষণের ক্ষীরটুকু ভোগ করছে এরাই।

অর্থনৈতিক মানদণ্ডে সংরক্ষণ হলেও তা গরিবদের কোন কাজে লাগবে না

জাতের ভিত্তিতে যারা সংরক্ষণের সুযোগ পাননি তাদের অনেকেই বলছেন, এস টি, এসসি বা ওবিসির মধ্যে যারা ধনী তাদের সংরক্ষণের আওতা থেকে বাদ দেওয়া হোক। সংরক্ষণ করা হোক অর্থনৈতিক মানদণ্ডের ভিত্তিতে, যারা গরিব তাদের জন্য। যারা এভাবে ভাবছেন তাদের ভেবে দেখতে হবে, গরিবদের জন্য শিক্ষায় ও চাকরিতে সংরক্ষণ করে দিলেই তারা কি তার সুযোগ নিতে পারবে? গরিবরা তো অভাব অনটনের জন্য পড়াশুনাই করতে পারছে না। চাকরির জন্য যে ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করা দরকার, তার আগেই গরিবরা পড়াশুনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে। এই গরিবদের কাছে সংরক্ষণের কোন মূল্যই নেই। যে দারিদ্রের কারণে এস টি, এসসি বা ওবিসির বৃহদাংশ সংরক্ষণ সত্ত্বেও চাকরি তো দূরের কথা শিক্ষা থেকেই বঞ্চিত, সেই একই কারণে দারিদ্রের জন্যই অসংরক্ষিত জনগণের গরিব অংশও তা থেকে বঞ্চিত। এই অবস্থায় গরিবরা লেখাপড়ার সুযোগ পাক — এটা যদি কেউ সত্যিই চান, তাহলে তার প্রথম কর্তব্য হবে এই দাবি তোলা যে, লেখাপড়ার সমস্ত আর্থিক দায়িত্ব সরকারকে বহন করতে হবে, শিক্ষাকে করতে হবে সম্পূর্ণ অবৈতনিক এবং ছাত্রদের ভরণপোষণেরও সমস্ত দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। ভারতের বুর্জোয়া সরকার কি এই দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত? সরকারের শিক্ষানীতি খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে সরকার শিক্ষার আর্থিক দায়িত্ব বহন করতে চায় না। এই সরকারের শিক্ষানীতি শিক্ষাকে বাজারের কেনাবেচার পণ্যে পরিণত করেছে। ফলস্বরূপ সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে আর্থিক বরাদ্দ কম করছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষকে ইচ্ছামত ফি, ডোনেশন বৃদ্ধির ছাড়পত্র দিয়ে দিয়েছে। বাস্তবে অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, তাতে টাকা যার শিক্ষা তার। শিক্ষার বিপুল খরচ যোগাতে না পেরে বহু ছাত্র পড়াশুনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে। বস্তুত এই বুর্জোয়া সরকার, এই বুর্জোয়া ব্যবস্থা জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের শিক্ষা, চাকরি — এক কথায় বেঁচে থাকার সামনে প্রতিবন্ধক হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে। ফলে শিক্ষা ও চাকরির সুযোগ না পাওয়ার জন্য যে ক্ষোভের সৃষ্টি সঙ্গত কারণেই হয়েছে, তার উদ্গীরণ হওয়া দরকার এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ধারক-বাহকরা মানুষকে বিভ্রান্ত করতে, বিপথগামী করতে একথাও প্রচার করে যে, সংরক্ষণের জন্য অসংরক্ষিতরা চাকরি পাচ্ছে না। এইভাবে তারা অসচেতন মানুষের ক্ষোভে সুড়সুড়ি দিয়ে তাকে বিপথে পরিচালিত করে এবং একই সঙ্গে সমস্যার মূল উৎস এই পুঁজিবাদী আর্থসামাজিক ব্যবস্থাকেও আড়াল করে। পুঁজিবাদী অর্থনীতির পরিণামে চাকরিই যেখানে প্রায় নেই, সেখানে সংরক্ষণের শতাংশ যাই হোক না কেন তা মূল্যহীন।

এই অবস্থায় সংরক্ষণ নিয়ে হানাহানি নয়, সর্বপ্রথম প্রয়োজন হল, সঙ্কুচিত হতে হতে চাকরির সুযোগ সামান্য হলেও যতটুকু আছে তাকে সর্বশক্তি দিয়ে রক্ষা করা এবং তার সম্প্রসারণ ঘটানো, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের ঐক্য গড়ে তুলে সরকারের ছাঁটাই নীতি, বিদায়নীতির বিরুদ্ধে, পদবিলুপ্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলা। একই সাথে শূন্যপদে নিয়োগ, কর্মসংস্থানমুখী শ্রমনিবিড় শিল্পস্থাপন, বন্ধ কারখানা খোলা প্রভৃতি দাবিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলা এবং সকলের জন্য শিক্ষা ও চাকরির দাবিতে ঐক্যবদ্ধভাবে সোচ্চার হওয়া এই মুহূর্তে এস টি, এসসি, ওবিসি সহ সকল অংশের মানুষের জরুরি কর্তব্য হিসাবে দেখা দিয়েছে। এই আন্দোলন শাসকের কাছ থেকে শুধু দাবি ছিনিয়ে আনবে তা নয়, এই আন্দোলনের চেতনা জাতপাতভিত্তিক সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে অটুট ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে মানুষের মধ্যে ইস্পাতদৃঢ় ঐক্য গড়ে তুলবে, যা শাসকশ্রেণী হাজার চক্রান্ত করেও ভাঙতে পারবে না। জাতপাতভিত্তিক সংকীর্ণ ভোট রাজনীতিও বন্ধ হবে, বন্ধ হবে সংরক্ষণকে কেন্দ্র করে রক্তপাতের ঘটনাও।

প্রকৃত যৌনশিক্ষার মূল কথা নৈতিকতার শিক্ষা

চারের পাতার পর

সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার দ্বারাই সংগ্রামলব্ধ উন্নত নীতি-নৈতিকতা তাঁরা আয়ত্ত করতে পারবেন এবং এই পথেই তাঁরা ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে শক্তিশালী ও প্রগতিশীল সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হবেন, যে আন্দোলন বিকাশের পথেই একমাত্র পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের বিনাশ ঘটাবে। এই আন্দোলনকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলার পাশাপাশি তাঁদের ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক ও মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষার দাবি তুলতে হবে, স্কুলস্তরে যৌনশিক্ষা প্রচলনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত করতে হবে। জনসাধারণকে অবক্ষয়িত, নোংরা সংস্কৃতিতে নিমজ্জিত করে দেওয়ার সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রকে পরাস্ত করার ক্ষেত্রে এই কষ্টকর ও পরিশ্রমসাধ্য দীর্ঘমেয়াদি সংগ্রামে যুক্ত হওয়া ছাড়া বিকল্প কিছু নেই।

এই প্রসঙ্গে আমরা, স্কুলস্তরে যৌনশিক্ষা প্রচলনে সিপিএম দলটির অতি উৎসাহের কথা মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। দলিত-নিপীড়িত মানুষের হাত থেকে সংগ্রামের হাতিয়ার কেড়ে নেওয়ার কাজে এই সিপিএম-ই আজ সব থেকে অগ্রণী। তারাই যে পুঁজিবাদের প্রধান রক্ষাকর্তা, তাদের 'বাম' নামাবলীর আবরণ ছিঁড়ে সে'কথা আজ সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। এ প্রসঙ্গে আমাদের পত্র-পত্রিকায় বহুবার আমরা কমরেড শিবদাস ঘোষের সতর্কবাণী উদ্ধৃত করেছি। বহুকাল আগেই তিনি দেখিয়েছেন যে, সিপিআই এবং সিপিএম তাদের জন্মলগ্ন থেকেই প্রকৃত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি হিসাবে গড়ে ওঠেনি। এদের নীতি ও কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে কীভাবে সোস্যাল ডেমোক্রেটিক চরিত্র পরিস্ফুট হয়েছে তা ব্যাখ্যা করার সাথে সাথে আমরা দেখিয়েছি যে, এরা শ্রম ও পুঁজির মধ্যে আপসকামী শক্তি। স্কুলস্তরে যৌনশিক্ষা প্রসঙ্গে এই দলগুলির দৃষ্টিভঙ্গি, এদের শ্রেণীচরিত্র সম্পর্কে আমাদের মূল্যায়ন যে কতটা সঠিক, তা আরও একবার দেখিয়ে গেল।

যৌনবিষয়ক শিক্ষাদানে পিতামাতাই উপযুক্ত শিক্ষক

আশার কথা এই যে, স্কুলস্তরে যৌনশিক্ষা চালু করার সরকারি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে অভিভাবক, শিক্ষক এবং খ্যাতনামা ব্যক্তিবর্গ প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা লক্ষ করছি, যৌনশিক্ষার নামে অবাধ যৌনতা ছড়িয়ে দেবার পুঁজিবাদী কৌশলের বিরুদ্ধে যাঁরা প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন, এ সংক্রান্ত বিশেষ সমস্যাটির মূলে আসলে মূল্যবোধের সঙ্কট কাজ করছে — এ'কথা এমনকী যাঁরা ধরতেও পেরেছেন, তেমন মানুষদের একাংশও মনে করছেন যে, আজকের এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে যৌন বিষয়ক এমন কিছু শিক্ষা বা নির্দেশিকা ছাত্রছাত্রীদের পাওয়া দরকার, যা হবে অত্যন্ত রুচিসম্মত এবং যা তাদের যৌন প্রবৃত্তিকে উৎসাহিত করবে না।

এক্ষেত্রে আমরা মনে করি, শিশু শিক্ষার্থী ও যুবসমাজকে যৌনতা বিষয়ক শিক্ষাদান তখনই যুক্তিযুক্ত ও কার্যকরী হতে পারে, যদি সেই শিক্ষা তাদের চরিত্র গঠনে এবং উচ্চতর মূল্যবোধ গঠনে সহায়তা করে। এ ছাড়া এই ধরনের শিক্ষা বা জ্ঞানের কোনও তাৎপর্য নেই। অতীতকালে মানবসমাজ প্রয়োজনীয় যৌনসম্পর্কিত জ্ঞান প্রকৃতি থেকেই আহরণ করেছে। ইদানীংকালে এ বিষয়ে জানার জন্য বিজ্ঞানের ভিত্তিতে লেখা বহু বইপত্রও পাওয়া যায়। ফলে উপযুক্ত বয়সে যৌনতা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করা কোনও সমস্যা নয়। বাবা-মায়েরা এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অতীতেও নিয়েছেন। তাছাড়া মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যসূচিতে ইতিমধ্যে বিশদভাবে যৌনতার জীববিদ্যাগত দিকটির পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা রয়েছে। ফলে স্কুলস্তরে যৌনতার জীববিদ্যাগত বা শারীরবিদ্যাগত আরও তথ্য ছাত্রছাত্রীদের জানানো দরকার — একথার কোন ভিত্তি নেই। তাছাড়া মানুষের যৌনতা কেবলমাত্র একটি শারীরবৃত্তীয় বিষয় নয়; এর সঙ্গে আরও বহু কিছু যুক্ত হয়ে রয়েছে। নীতি-নৈতিকতা, সৌন্দর্যবোধ, ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ, নিজের সম্পর্কে এবং সমাজ সম্পর্কে দায়িত্ববোধ ইত্যাদি বিষয়গুলি মানুষের যৌনজীবনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। এই আশংকা সম্পর্কেও আমরা একেবারেই চোখ বুঁজে থাকতে পারি না যে, বর্তমান সমাজের সার্বিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের পরিবেশে একজন শিক্ষক কখনও যৌনবিকৃতির শিকার হয়ে গিয়ে যৌনশিক্ষা দেওয়ার সুযোগের অপব্যবহার করবে না বা বিকৃত মানসিকতার প্রশ্রয় দেবে না। এখন এ বিষয়ে শিক্ষাদান করে কিশোর-কিশোরীদের সুকুমার মনে সুস্থ মূল্যবোধের আধারে যৌনতা সম্পর্কিত ধারণা প্রকৃতই কার পক্ষে গড়ে তোলা সম্ভব? এটা অবশ্যই হওয়া চাই ব্যক্তিভিত্তিক, সুনির্দিষ্ট এবং প্রতিটি কিশোর-কিশোরীর ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা। প্রকাশ্য ক্লাসঘরে বসে এ'কাজ করা সম্ভব নয় এবং সমস্ত শিক্ষকও এই আলোচনা করবার পক্ষে যোগ্য নন।

জীবনের সকল শিক্ষা স্কুল-কলেজ দিতে পারে না। স্কুলে ধর্মীয় নীতি শিক্ষা দেওয়ার রীতি, অপরাধ থেকে সমাজকে মুক্ত করতে পারেনি। বহুক্ষেত্রে মানুষ শিক্ষা নেয় সমাজ থেকে। যৌন নীতি শিক্ষাও তেমনই একটা বিষয়, যার শিক্ষা সমাজই দেয়। আর সমাজের সামগ্রিক নৈতিক মান উন্নত করতে পারে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। আমাদের মতে, যৌনশিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের পিতা-মাতারাই প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালন করতে পারেন। ইদানীং বলা হচ্ছে যে, বাবা-মায়েরা ছেলেমেয়েদের প্রয়োজনীয় সময় দিচ্ছেন না। কিন্তু সময়ের চেয়েও এখানে বড় হল মানসিকতা। পিতামাতার সম্পর্কের মধ্যেকার সৌন্দর্যই সন্তানকে পাশবিকতা থেকে মুক্ত করে। সংগ্রাম ছাড়া সৌন্দর্য সৃষ্টি হয় না। বর্তমান সমাজের অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামই হল সুস্থ যৌনমানসিকতা ফিরিয়ে আনার একমাত্র পথ।

R. No 5268 / 60
Postal Registration No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2007-09
P. R.(Fgn) No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/FGN - 028/2007-09

‘ঘরছাড়া’ ইস্যু তুলে নন্দীগ্রামের মূল দাবিকে ধামাচাপা দিতে চায় সরকার

সাংবাদিক সম্মেলনে কমরেড প্রভাস ঘোষ

এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২১ জুন কলকাতায় দলের রাজ্য দপ্তরে এক সাংবাদিক সম্মেলন করেন। শুরুতেই, নন্দীগ্রামে সিপিএমের ক্রিমিনালবাহিনীর লোকজনের পরিবারগুলির যে ৩১৮ জন ঘরছাড়া হয়ে বাইরে রয়েছে, তাদের নামের তালিকা (গ্রামের নাম সহ) সাংবাদিকদের হাতে তুলে দিয়ে ‘হাজার হাজার’ কর্মী ঘরছাড়া বলে সিপিএম যে প্রচার করছে, তার মিথ্যাচার সুনির্দিষ্টভাবে তিনি দেখিয়ে দেন। তিনি বলেন ঃ

“আমরা আশঙ্কা করছি, নন্দীগ্রামের জনগণের ওপর আর একটা ভয়ঙ্কর আক্রমণ ঘটতে চলেছে। ইতিপূর্বে সিপিএম নেতা বিনয় কোঙার যখন বলেছিলেন — নন্দীগ্রামকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ওদের জীবন ‘হেল’ করে দেব, ঠিক তারপরই ঘটেছিল ১৪ মার্চের ভয়ঙ্কর আক্রমণ, গণহত্যা ও গণধর্ষণ। আর, এবার তমলুকে গিয়ে তিনি বলেছেন — বাঘকে আগে বন্দী করতে হবে, তারপর তাকে ঘাস খাওয়াতে হবে। অর্থাৎ, নন্দীগ্রামের জনগণকে আগে বন্দী করবেন, তারপর ঘাস খাওয়াবেন। এই উক্তি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।”

কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, “সিপিএম ও রাজ্য সরকার একদিকে প্রতিদিনই শান্তির প্রস্তাব দিচ্ছে, শান্তির বৈঠক করছে, অন্যদিকে খেজুরির সীমান্ত থেকে সিপিএম ক্রিমিনাল বাহিনী প্রতিদিন নির্বিচারে গুলি ও বোমাবর্ষণ করে যাচ্ছে, এবং ক্রমাগত এর তীব্রতা বাড়ছে। সিপিএম ষড়যন্ত্র করেছে, এইভাবে তারা নন্দীগ্রামের জনগণকে সন্ত্রস্ত করবে এবং ধীরে ধীরে তাদের মনোবল ভেঙে দেবে। অন্যদিকে, বাইরে প্রচার করবে — দু’পক্ষে লড়াই হচ্ছে, দু’পক্ষই বহিরাগত আমদানি করেছে। বাস্তবে একপক্ষই আক্রমণ করছে, বহিরাগত এনেছে, এবং তারা সিপিএমের পক্ষ। নন্দীগ্রামের জনগণ আক্রান্ত, তারা আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে। এখানে বহিরাগত-র কোন অস্তিত্বই নেই।”

কমরেড প্রভাস ঘোষ আরও বলেন, “নন্দীগ্রামের জনগণের দাবি — যা পূরণ করলেই একমাত্র শান্তি ফেরানো সম্ভব, তা হল — যারা খুন করেছে, ধর্ষণ করেছে, তাদের গ্রেপ্তার করতে হবে। ১৪ মার্চ যে পুলিশ অফিসারেরা দাঁড়িয়ে থেকে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে ও ধর্ষণ করিয়েছে, তাদের শাস্তি চাই। নিহত-আহতদের ক্ষতিপূরণ চাই। এই প্রশ্নে সরকার সম্পূর্ণ চুপচাপ। এখন তারা সমস্ত বিষয়টাকে ধামাচাপা দিয়ে এমনভাবে আনছে যেন সমস্যাটা হচ্ছে — ঘরছাড়ারা ঘরে ফিরতে পারছে না, তাদের ঘরে ঢোকাতে হবে এবং নন্দীগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার এইটাই পথ। নন্দীগ্রামের ঘরছাড়াদের তালিকা আমরা সংগ্রহ করেছি। হাজার হাজার মানুষ ঘরছাড়া হয়ে বাইরে আছে — এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। সিপিএমের যেসব ক্রিমিনালরা খুন-ধর্ষণ করেছে, তারা জনরোষের ভয়ে তাদের পরিবারের লোকজন ও আত্মীয়স্বজন নিয়ে এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে এবং সেই সংখ্যা ৩১৮ জন। নন্দীগ্রামের জনগণ বলছে, যে ২৯ জন খুনি ও ধর্ষণকারীর নাম তারা কমিশনের সামনে সাক্ষ্য হিসেবে দিয়েছে, তারা ছাড়া বাকি সবাই নিরাপদে বাড়ি ফিরে আসতে পারেন, এবং ইতিমধ্যে ৫৭ জন ফিরেও এসেছেন।”

তিনি বলেন,“শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে পুলিশ ঢুকিয়ে নন্দীগ্রামের জনগণের ওপর আক্রমণ করে এই ক্রিমিনালদের নন্দীগ্রামের ভেতরে ঢোকানোর ষড়যন্ত্র চলছে। এটা নন্দীগ্রামের জনগণ কিছুতেই মেনে নেবে না।”

তিনি বলেন, “নন্দীগ্রামে যা কিছু অশান্তি হচ্ছে, তার কারণ হল, সীমান্তের ওপারে খেজুরি থেকে সিপিএমের আক্রমণ। কিন্তু নন্দীগ্রামের ভেতরে বিস্তীর্ণ এলাকায় মাসের পর মাস সিপিএম-ক্রিমিনালদের সহযোগী বলে পুলিশকে ঢুকতে না দেওয়া হলেও আজও সেখানে কোন চুরি-ডাকাতি-খুন-অশান্তি বলে কিছু নেই। সেখানে দোকান-পাট, হাট-বাজার, স্কুল, যানবাহন—সব চলছে। সেখানকার আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করছে নন্দীগ্রামের সংগ্রামী জনগণ। এটাও ভারতবর্ষে একটা নজিরবিহীন ঘটনা। নন্দীগ্রাম দেখাচ্ছে— জনগণের ঐক্য ও সংগ্রাম কীভাবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করতে পারে।”

সবশেষে তিনি বলেন, “সিপিএম নতুন করে নন্দীগ্রামের ওপর যে আক্রমণ করতে যাচ্ছে সে সম্বন্ধে আমরা রাজ্যের জনগণকে সজাগ করতে চাই এবং আমরা বিশ্বাস করি, ১৪ মার্চের পর শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী সহ সারা পশ্চিমবাংলার মানুষ যেমন করে এগিয়ে এসেছিলেন, তেমন করে তাঁরা এবারও আবার এগিয়ে আসবেন, বিপন্ন নন্দীগ্রামের জনগণের পাশে দাঁড়াবেন।”

বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন সরকারের রবার স্ট্যাম্পের ভূমিকা নিয়েছে

একের পাতার পর

করেছে সেইজন্য পুরস্কার হিসাবে মাশুল বৃদ্ধির অনুমোদন দিতে হবে। কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী প্রতি বছর ১ শতাংশ বন্টন ও সঞ্চালনে ক্ষতির পরিমাণ কমানোর কথা থাকলেও ২০০৭-০৮ সালে মাত্র ০.২৫ শতাংশ কমানোর অনুমোদন চাওয়া হয়েছে। সাথে ঋতুভিত্তিক ট্যারিফ চাহিদার সময় অনুযায়ী বা টি ও ডি ভিত্তিক ট্যারিফ এবং ৩ বছর অন্তর মাশুল নির্ধারণ প্রথা চালু করার উদ্দেশ্যে তাদের বর্তমান প্রস্তাবকে গ্রাহ্য করার জন্য আবেদন করেছে এবং রিজনেবল রিটার্ন ১ শতাংশ বৃদ্ধির আবেদন করেছে। সিঙ্গুর হরিপাল কোঅপারেটিভ একটি ভিন্ন ব্যবসায়িক সংস্থা হওয়া সত্ত্বেও সেই কোম্পানির ঘাটতি পূরণের জন্য ৪২ কোটি এবং ২০০৪-০৫ সালে সঠিক তথ্য দিতে না পারার জন্য পর্ষদের যে ২৭৩ কোটি টাকা মাশুল বৃদ্ধির অনুমোদন কমিশন দেয়নি, বর্তমান বছরেও সেই তথ্য না দিয়েই তার মধ্যে ৪৯.৭৩ কোটি টাকা এবং ঋণ নেওয়া টাকার সুদ বেশি করে দেখানোর জন্য যে টাকার অনুমোদন দেওয়া হয়নি, তার মধ্যে ৩১.৮৬ কোটি টাকার অনুমোদন চেয়েছে রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানি। সাথে সাথে বন্টন ও সঞ্চালনে ক্ষতির পরিমাণ ২.৫ শতাংশে না কমিয়ে ১.৭ শতাংশ বৃদ্ধি করে ২৪.৭ শতাংশ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। উভয় কোম্পানিই তথাকথিত পারস্পরিক ভর্তুকি বিলোপ নীতি প্রয়োগ করে ছোট বিদ্যুৎ গ্রাহকদের মাশুল বাড়িয়ে বৃহৎ শিল্প ও বহুজাতিক সংস্থাগুলির মাশুল কমাবার প্রস্তাব করেছে। এসইডিএল এমনকী পাবলিক লাইট ও জল সরবরাহের ক্ষেত্রে মাশুল বৃদ্ধির প্রস্তাব করেছে। ক্ষুদ্র শিল্পে ফিক্সড চার্জ প্রতি এইচপি-তে ১১ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৫ টাকা করার প্রস্তাব করেছে, যা অন্য কোথাও নেই।

সকলেরই জানা আছে যে, গত ১ এপ্রিল থেকে পর্ষদ ভেঙে ৩টি কোম্পানি তৈরি করা হয়েছে — বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম, বিদ্যুৎ সঞ্চালন কোম্পানি লিমিটেড ও বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানি লিমিটেড। এই তিনটি কোম্পানি এবারে পৃথক পৃথকভাবে মাশুল বৃদ্ধির আবেদন করার ফলে পর্ষদ এলাকার গ্রাহকদের মাশুল অনেকখানি বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা এদের প্রস্তাব থেকে বোঝা যাবে না।

সকলেই দেখতে পাচ্ছেন যে, ব্যাপক লোডশেডিং ও লো-ভোল্টেজ হয়েই চলেছে। এই লোডশেডিংয়ের প্রকৃত কারণ হ’ল বিদ্যুৎ প্ল্যান্টগুলোতে উৎপাদন প্রয়োজন অনুযায়ী করা হচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎমন্ত্রী নিজেই জানিয়েছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১০ হাজার মিলিয়ন মেগাওয়াট-এর বেশি। আর চাহিদা ৭ হাজার মিলিয়ন মেগাওয়াটের মতো। তাহলে সারা বছর ধরে এই লোডশেডিং, লো-ভোল্টেজের যন্ত্রণা দেওয়া হচ্ছে কেন? তার কারণ হল, ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও প্রয়োজন অনুযায়ী উৎপাদন করা হচ্ছে না। প্ল্যান্টগুলোতে উৎপাদন করা হচ্ছে কোম্পানিগুলির অতি মুনাফার প্রতি লক্ষ রেখে। রাজ্য সরকার ও কমিশন সব কথা জেনেও কোম্পানিগুলির স্বার্থে মিথ্যা কথা প্রচার করেছে যে, লোডশেডিংয়ের কারণ হ’ল চাহিদা বৃদ্ধি, এবং পুরনো লাইন। আরও মিথ্যা বলছে যে, আগামী বছর থেকে লোডশেডিং কমে যাবে। আমরা মনে করি, এইভাবে চলতে থাকলে আগামী বছরে লোডশেডিং ও লো-ভোল্টেজের আক্রমণ বেড়ে যেতে পারে।

কেন্দ্রীয় সরকার নিয়োজিত কে পি রাও কমিটি বলেছে, প্রতিটি প্ল্যান্টের উৎপাদন ক্ষমতার ৯০ শতাংশ কাজে লাগিয়ে উৎপাদন করতে হবে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে তা করা হচ্ছে না। সিইএসসি-তে গড়ে ৮৫ শতাংশ আর পিডিসিএল-এ বর্তমানে ৬৮ শতাংশ প্রয়োগ করা হচ্ছে। আগামী বছরে তা কমিয়ে যথাক্রমে ৮০ শতাংশ এবং ৬৫ শতাংশ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। কোম্পানিগুলির ব্যবসায়িক স্বার্থ রক্ষা করার জন্য এই প্রস্তাবকে অনুমোদন দেওয়া হলে আগামী বছর আরও ব্যাপক লোডশেডিং নেমে আসবে।

এইসব কোম্পানিগুলির স্বার্থ রক্ষা করার জন্য কমিশন এ’বছর রেগুলেশন পরিবর্তন করেছে। ট্যারিফ রেগুলেশন পরিবর্তন করে ইক্যুইটি ভিত্তিক মাশুল নির্ধারণের অনুমোদন দিয়েছে। অত্যন্ত বিস্ময়ের কথা হ’ল, বিদ্যুৎ কোম্পানিগুলির মুনাফা বৃদ্ধির জন্য রেগুলেশন পরিবর্তন করা হচ্ছে কিন্তু জাতীয় বিদ্যুৎ নীতিতে যতটুকু জনস্বার্থের কথা বলা হয়েছে তাকে কার্যকর করার জন্য সরকার ও কমিশনের কোনও উদ্যোগই নেই। জাতীয় বিদ্যুৎ নীতিতে ৩০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ গ্রাহকদের ৫০ শতাংশ কম দামে বিদ্যুৎ দেবার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে তা এখনও কার্যকর করা হয়নি। বর্তমান বছরেও মাশুল নির্ধারণে তা প্রয়োগের কোনও প্রস্তাব নেই।

আমরা এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধির কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। কোম্পানির কোনও লোকসান ছাড়াই মাশুল কমানো যেতে পারে। অ্যাবেকা কমিশনের কাছে হিসাব পেশ করে দেখিয়েছে যে, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে কোনও বিদ্যুৎ সংস্থারই মাশুল গড়ে ২ টাকা ইউনিটের বেশি হতে পারে না। এর সাথে বিদ্যুৎ আইন ২০০৩-এর ৬২(৩) ধারাটি জনস্বার্থে প্রয়োগ করা হলে অনায়াসেই কৃষিতে ৫০ পয়সা ইউনিটে এবং গৃহস্থ, ক্ষুদ্র শিল্প ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ১ টাকা ইউনিটে বিদ্যুৎ দেওয়া যেতে পারে। আর অন্যান্য রাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুতে ১ হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি দিলে কৃষিতে, অতি ক্ষুদ্র শিল্পে, ক্ষুদ্র ব্যবসায় ও লোকদীপ প্রকল্পের গ্রাহক ও ক্ষুদ্র গৃহস্থদের বিনা পয়সায় বিদ্যুৎ দেওয়া যেতে পারে যা রাজ্যের প্রকৃত উন্নয়নের জন্য আশু প্রয়োজন।

অ্যাবেকার নেতৃবৃন্দ বলেন, একথা সকলেই জানেন যে, বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধি ঘটলে সব জিনিসের দাম বাড়বে আর মাশুল কমলে সব জিনিসের দাম কমবে। এ বিষয়টিও দিবালোকের মতো সত্য যে, পশ্চিমবঙ্গ আজ বৃহৎ শিল্প ও বহুজাতিক সংস্থাগুলির উপর নির্ভর করে বেঁচে নেই। পশ্চিমবঙ্গ বেঁচে আছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং কৃষির উপর নির্ভর করে। বিদ্যুৎ কোনও ভোগ্যপণ্য নয়, বিদ্যুৎ পরিষেবা, উৎপাদনের হাতিয়ার। সেই কারণে কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্পে কম দামে বিদ্যুৎ দিয়ে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ও পণ্যের দাম কমানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

জাতীয় বিদ্যুৎনীতি ও রাজীব গান্ধী বিদ্যুৎ যোজনার ঘোষণা অনুযায়ী ২০১২ সালের মধ্যে প্রতিটি ঘরে সরকারের বিদ্যুৎ পৌঁছে দেবার কথা। বিদ্যুৎ মাশুল না কমালে সেই ঘোষণা কার্যকর হতে পারে না। ঘোষণাটি লোকঠকানোর হাতিয়ারে পরিণত হতে বাধ্য।

সমস্ত দিক বিচার করে অ্যাবেকা এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, ২০০৭-০৮ সালে বিদ্যুৎ মাশুল কমিয়ে রাজ্যের সঙ্কটগ্রস্ত কৃষি ও ক্ষুদ্রশিল্পকে রক্ষা করে আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া জনগণের উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

অ্যাবেকা নেতৃবৃন্দ বলেন, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, বিশ্বায়নের তল্পিবাহক রাজ্য সরকার ও সরকারের রবার স্ট্যাম্প বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের উপর ভরসা রেখে সে কাজ হবে না। গড়ে তুলতে হবে গণপ্রতিরোধ। ২০০৭-০৮ সালের মাশুল ঘোষণার আগে থেকেই আমরা সেই প্রতিরোধ শুরু করছি। কমিশন যাতে বর্ধিত মাশুল ঘোষণা করতে না পারে এবং মাশুল কমাতে বাধ্য হয়, সেই উদ্দেশ্যে আমরা রাজ্যের বিদ্যুৎ গ্রাহকদের ২৫ জুন থেকে ২৯ জুন পর্যন্ত বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন দপ্তরে লাগাতার বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান করছি। তাতেও কাজ না হলে রাজ্যব্যাপী সর্বস্তরের গ্রাহকদের বিল বয়কট করার প্রস্তুতি নিতে বলছি।

অ্যাবেকা দাবি জানিয়েছে — সিইএসসি এবং এসইডিসিএল সহ রাজ্যের সব বিদ্যুৎ কোম্পানির মাশুলবৃদ্ধির প্রস্তাব বাতিল করতে হবে, প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের মাশুল গড়ে ২ টাকা করতে হবে, কৃষিতে ৩ একর পর্যন্ত বিনা পয়সায় এবং পরবর্তী স্তর থেকে ৫০ পয়সা ইউনিটে বিদ্যুৎ দিতে হবে, ক্ষুদ্র শিল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও গৃহস্থকে ১ টাকা ইউনিটে বিদ্যুৎ দিতে হবে, বিদ্যুতে ১ হাজার কোটি টাকা সরকারকে ভর্তুকি দিতে হবে, অবিলম্বে লোডশেডিং ও লো-ভোল্টেজ বন্ধ করতে হবে এবং গ্রাহকদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, এবং তথাকথিত পারস্পরিক ভর্তুকি বিলোপনীতি প্রয়োগ বন্ধ করতে হবে।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৭১৯৫৪, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৯১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in